দ্বিতীয় পক্ষ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পক্ষ অবশ্যই এক অভিজ্ঞতা।
মানুষ নতুনের ভক্ত। আমরা
সাবানের ব্র্যান্ড পালটাই।
জামা বদলাই।একই টুথপেষ্ট
সারা জীবন ব্যবহার করি না।
যা সহজে পালটানো যায়
আমরা তা পালটাই।
মনস্তাত্ত্বিকরা বলছেন, পলিগ্যামি ইজ
এ টেনডেনসি ইন ম্যান।
আমরা আনন্দে থাকা বলতে বুঝি

ভোগে থাকা।
আমরা ভাবি টাকা থাকলেই মানুষ সুখী।
আমরা ভাবি সব কিছু কেনা যায়।
কেনা যায় বোধহীন জড় সামগ্রী।
ভালোবাসা কেনা যায় না।
কেনা যায় না শান্তি। ভালবাসা শূন্য
এই কালে পক্ষ একটাই- প্রতিপক্ষ।

আমার প্রথম পক্ষের বউটি ছিল বড় সাদাসিধে। টাটকা পাঁউরুটির মতো নরম তুলতুলে। ফোলা ফোলা গাল। কাঁচের মতো চোখ। বড় বড় চোখের পাতা। ফর্সা ধবধবে রঙ। খুব নিচু গলায় কথা বলতো। ধীর চলন। ধীর বলন। সবাই বলতো, আহা, মা লক্ষ্মী যেন পট ছেড়ে নেমে এসেছে। শোভনের কি ভাগ্য! এ যেন বানরের গলায় মুক্তোর মালা। আমি ঠিক বানর নই, তবে গো হাড় গিলের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে মনটা কেমন কেমন করে ওঠে। এই যদি মানবের চেহারা হয় দানব কাকে বলে। এতখানি একটা বুকের ছাতি। এক ইঞ্চিও খালি নেই। সর্বত্র কুঁচি কুঁচি লোম। মুখটা কেমন চোয়াড়ে মার্কা। এমন একটা অকাট্যিক চেহারা খুব কম দেখা যায়। হাসলে মুলোর মত দাঁত বেড়িয়ে পড়ে। চোখের দৃষ্টি যেন, আবার খাবো সন্দেশ। সব সময়েই ঘোলাটে লাল। নেশা ভাঙ না করেই এই অবস্থা। করলে কি হত!

আমার দোষ নেই। আমার যখন যৌবন আসছে। বয়সা লেগে গলা ভারি, ঠোঁটের ওপর কচি গোঁফের রেখা, সেই সময় এক ব্যায়াম বীরের পাল্লায় পড়ে মিস্টার ইণ্ডিয়া হবার ইচ্ছে হয়েছিল। সেই সময় আমি ডেলি একশো ডন, দুশো বৈঠক

মারতুম। ডাম্বেল, বারবেল, প্যারালালবার, রোমান রিং নিয়েও কসরতাকসরত চলত। শরীরের যেখানে যত মাংস পেশী ঘুমিয়ে ছিল সব ঠেলেঠুলে উঠে পড়ল। নিজেই অবাক, মানুষের এত সব থাকে! বেশ মজা লাগতো। নেশাও ধরে গিয়েছিল। রোমান রিং করতে গিয়ে চোয়াল ভেঙে যাচ্ছিল, সে খেয়াল ছিল না। দেখতে দেখতে একটা হেঁড়ে মতো লোক হয়ে গেলুম। হাতুড়ি পেটানো চেহারা।

শরীর যখন সেট করে গেল তখন আমার ব্যায়াম গুরু বললেন, হলো বটে, তবে কি জানো গরিবের যা হয়, ঘি, দুধ, মাখন, ডিম, ছানা তো তেমন পড়ল না, তার ফলে শরীরটা একটু পাকতেড়ে হয়ে গেল। খুব ইচ্ছে সিনেমার হিরো হব। হল না। আমার দোষ নয়। দোষ বাঙলা ছবির চলনের। মেয়ে মেয়ে চেহারা না হলে হিরো হওয়া যায় না। গাছের ডাল ধরে বাঁকা শ্যাম হয়ে দাঁড়াতে হবে আর পেঁয়াজ খোসা শাড়ি পরে নায়িকা বেসুরো গান গাইবে, তুমি আমার আমি তোমার হে রে রে রে করে একবার এ গাছের ডাল ধরে কেতরাতে কেতরাতে ওগাছ, সে গাছের ডাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে আদিখ্যেতা করবে। বেশি ছোটাছুটি করতে পারবে না, কারণ কোমরে বাত। হেঁপো নায়ক বেতো নায়িকা। শুকনো গাছের ডাল। ফুচকে ডিরেকটার। এক ডিরেকটার বললে, এ দেশে যখন র‍্যাম্বো হবে তখন তোমার মতো ঘোড়ার দরকার হবে। এখন ডন বৈঠক চালিয়ে যাও। এখনকার স্ক্রিনে ওই চেহারা গান গাইছে দেখলে অডিয়েনস মূর্ছা যাবে। উত্তমকুমারের যুগ ভাই, এখানে খাপ খুলতে এস না।

মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াই। না হল সিনেমা। না হল প্রেম। ডিরেকটারদের কত বোঝালুম, মশাই, যে কোনও ওজনের নায়িকাকে আমি ঝাড়া তিন ঘণ্টা, পায়ের তলায় আর মাথার তলায় হাত দিয়ে তুলে পাঁজা কোলা করে রাখতে পারি। ট্রায়াল দিয়ে দেখুন। এ হল বারবেল ভাঁজা হাত। অন্য যে কোনও নায়ক পারবেই না। হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। আমি ওয়েট লিফ্‌টার। ডিরেক্‌টার বললেন, তোমার অ্যাপ্রোচে ভুল হচ্ছে। নায়িকারা বারবেল নয়। সিনেমা ব্যায়ামাগার নয়। আমাদের সিনেমায় দুটোই সাবজেক্ট, প্রেম আর ব্যর্থ প্রেম। এর বাইরে কেরামতি করতে গেলেই ফ্লপ। ছোট খাটো দু একটা প্রেম করতে গেলুম। বাবা, সেখানে যা কমপিটিশান! চাকরির বাজারকেও হার মানায়। একটা পোস্ট, এক হাজার অ্যাপ্লিক্যান্ট। শেষে একটা কারখানা করে ফেললুম। আমার ওই লোহালক্কড় আর নাট বল্টুই ভালো। প্রাণ খুলে ঘষা যায়। টাইট দেওয়া যায়। গ্রুপ কাটা যায়। আর আমার ব্যায়াম গুরুর রয়্যাল

এনফিল্ড মটোর বাইকটা কিনে নিলুম। ব্যাপারটা বেশ জমে গেল। বাঙলা ছবিতে নায়িকা তুলে আমার ক'পয়সা হত। যা হত তাও আবার ট্যাক্সে যেত। মালে উড়ত। এ তবু লোহা তুলে দুটো পয়সার মুখ দেখলুম। বাড়ি হল। ভুরভুরে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি হল। গাড়িটা মটোর সাইকেলের মতো শব্দ করলেও চলে। ধমকাতে ধমকাতে চলে। মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দেয়। একবার এক সায়েব আমার গাড়ি চেপে বলেছিলেন, ভেরি ইণ্টারস্টিং। এর একটা নিজস্ব ক্যারেক্টার আছে।

চেহারার গরমের সঙ্গে টাকার গরম। ডবল গরমে ব্যাপারটা কেমন যেন হয়ে গেল। আমাদের ফ্যামিলিটা চিরকালই একটু গোঁয়ার গোবিন্দ টাইপ। আমার বাবার এমন গোঁ ছিল যে সবাই বলত রাইনোসেরাস অফ নর্থ ক্যালকাটা। আমার মা আবার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জেলার মেয়ে। যেমন রাগী তেমনি গম্ভীর। ফলে আমার মেজাজও সেই রকম হয়েছে? আমি আমার মা দুজনে মিলে আমার সেই প্রথম পক্ষের তুলতুলে বউটাকে ধামসে ধামসে শেষ করে দিলুম। বেড়ালের যা স্বভাব, নরম মাটি দেখলেই আঁচড়াবে।

বাবা চলে যাবার পর মা একটু আয়েসী হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া যারা একটু ধর্মকর্ম নিয়ে থাকে তারা নিষ্ঠুর হয়। হতেই হবে। সারা দিন মালা জপ করতে করতে মন ইষ্ট মুখী। ইষ্ট ছাড়া আর কাউকে ভালবাসা অন্যায়। ধার্মিকরা মানুষকে সেবাপরায়ণ হতে বলেন। আমার প্রথম পক্ষের বউ সেবা করে করে, সেবা করে করে কাহিল হয়ে পড়ল। আর আদর্শ স্বামী হল ওভারসিয়ারের মতো। তার কাজ হল বউ সংসারে কাজ করছে কি না দেখা। পান থেকে চুন খসলেই হম্বিতম্বি করা। ছড়ি ঘোরানো। আমার মতো একটা স্বামী তো আর সৈত্রণ হতে পারে না। মাঝে মধ্যে হাতটাতও চালিয়ে দিতুম। ফোঁসফোঁস করে কাঁদত। বড় বড় চোখের পাতা জলে ভিজে বেশ দেখাত। সে আর এক বিউটি। সকলে আমার প্রশংসাই করত। সবাই বলত, ঐ দেখ রাম ভক্ত হনুমান নয়, মা ভক্ত ভোম্বল। আমার ডাক নাম ভোম্বল।

আমরা তাকে সেবাপরায়না, সহনশীলা, সতীসাধ্বী করতে চেয়েছিলাম। এ কথা তো ঠিক সংসারের কড়ায় বেশ করে ভাজা ভাজা করতে না পারলে মেয়েরা খোলতাই হয় না। মানুষও তো চামড়া। কাঁচা চামড়াকে কষা হরীতকীর জলে অষ্টপ্রহর ভিজিয়ে রেখে পাকা করতে হয়। তা করব কি? সে মরেই গেল। আমার খুব দুঃখ হল। মা বললে, ছেলেদের অত নরম হলে চলে না। সবাই কি আর সব কিছু নিতে পারে! পারে না। পরীক্ষায় ফেল করেছে। হেরে

গেছে। আত্মহত্যা করেছে। দেখিস নি অনেক নতুন কাপড় এক ধোপেই ছিঁড়ে যায়। আমরা তখন বলি, ধোপে টিকল না।

সত্যি আমার মা সিদ্ধি লাভ করেছে। তা না হলে এমন সুন্দর সুন্দর কথা রেরোয়! ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতো। মায়ের কথায় ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আরে আমার বন্ধু বিভাসের কি হল! ইণ্ডিয়ান নেভিতে চাকরি পেয়ে চলে গেল। এক মাসের মধ্যে ন্যাড়া মাথা হয়ে ফিরে এল। আমরা বললুম, এ কি রে! বিভাস বললে, ভাই, প্রথমেই তো চুল কদমছাঁট করে দিলে। তারপর সে কি ট্রেনিং রে ভাই! মাস্তুল বেয়ে ওঠো মাস্তুল বেয়ে নামো। দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে এ জাহাজ থেকে ও জাহাজে যাও। একটা জাহাজের গোটা ডেক জল আর বুরুশ দিয়ে ঘসে ঘসে ধোও। সে যে কি কাণ্ডরে ভাই! পালিয়ে এসেছি। তা পালাবো বললেই কি পালানো যায়। বিভাসকে আবার পাকড়াও করে নিয়ে গেল। তারপর কি হল জানি না! বিভাস পালিয়ে এসেছিল আই. এন. এস বিক্রম থেকে। আমার বউ পালালো আমাদের বিক্রম থেকে।

আজকাল বাড়ি যেমন খালি পড়ে থাকে না। থাকার উপায় নেই। রোজগেরে ছেলেও তেমন পড়ে থাকে না। প্রথম প্রথম দিন কতক লোকে রাস্তায় ঘাটে আঙুল তুলে দেখাত, ওই দেখ, ওই লোকটার বউ আত্মহত্যা করেছে। মায়ের নামেও নানা কথা বলতো? 'মুখে হরি বলি, কাজে অন্য করি'। শুনিয়ে শুনিয়ে গান গাইতো। আমার পাশের বাড়িতে একটা ডেঁপো মেয়ে আছে। সেই মেয়েটাই বেশি গাইতো। কি করবো, এ সবের তো প্রতিবাদ চলে না। মা বলতেন, সহ্য কর। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে গেছেন শ. ষ. স। সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। কেউ কেউ আবার গল্প শোনাতো, 'আহা কত্তার কি দয়ার শরীর?' গল্পটা আমার জানা। তিন ছেলে চোরকে ধরে পেটাচ্ছে। চোরের আর্তচিৎকার শুনে কত্তা দোতলা বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। নিচের উঠুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওরে তোরা করছিস কি! তোদের কি এতটুকু দয়ামায়া নেই! কৃষ্ণের জীব। ধরে পেটাচ্ছিস! ওটাকে বস্তায় ভরে, মুখে দড়ি বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আয়।' চোর হাত জোড় করে ওপরের বারান্দার দিকে মুখ তুলে বললে, 'আহা কত্তার আমার কি দয়ার শরীর!'

দিন কয়েক মা খুব ভয়ে ভয়ে ছিলেন? যতই জপধ্যান করুন, যুগধর্ম বলে একটা জিনিস তো আছে। প্রায় জিজ্ঞেস করতেন, 'হ্যা রে, পুলিশে আবার ধরে টানাটানি করবে না তো?'

ভয় পাবারই কথা। কাগজ টাগজ পড়েন। দেখেন তো, শাশুড়ীরা আজকাল কি হারে নিগৃহীতা হচ্ছেন। ধরে সেণ্ট্রাল জেলে চালান করে দিলেই হল। বউদের ইউনিয়ান হয়েছে। শাশুড়ীদের কোন ইউনিয়ান নেই। আমি মাকে সাহস দিতুম, 'তুমি ভেবো না মা। যেখানে যা পুজো দেবার নিয়ম, সব দিয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে ফেলেছি। ভগবান আমাদের সহায়। হিন্দু ম্যারেজের সুবিধেটা কি জানো, কোথাও কোনো রেকর্ড থাকে না।' সাহস দিলে কি হবে। আবার এ ও ভাবতুম মানুষ বড় সাংঘাতিক জীব। যীশুকেই ক্রুশে ঝুলিয়ে দিলে। এখন মায়ের মতো ধার্মিক আর আমার মতো মাতৃভক্তকে ধরে পুরে দিলেই হল। যুগ ধর্মের কাছে জপের মালার ধর্ম কি দাঁড়াতে পারবে।

যাক টাকার ধর্মে সবই হয়। আমার প্রথমপক্ষটা এতই বোকা ছিল, এত অজ্ঞ, যে তার এইটুকু জ্ঞান ছিল না আত্মহত্যা করার আগে একটা চিরকুটে লিখতে হয়, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নয়। এটা লিখে মরতে না হয় আর পাঁচটা মিনিট দেরি হত। আমি যার জন্যে এত ভাবলুম সে আমার জন্যে এইটুকু ভাবতে পারল না। দুনিয়ায় স্বার্থ ছাড়া কিছুই নেই। মনটা এত খিঁচড়ে গেল যে প্রথম পক্ষকে ভুলেই গেলুম।

আজকাল কাগজে পাত্র পাত্রীর কলাম হয়েছে। দ্বোজপক্ষে আপত্তি নেই দেখে গোটা কতক চিঠি ছাড়লুম। একটা লেগে গেল। আসলে বিয়ে একটা নেশা। সিগারেট খাওয়ার মতো। একটা ধরালে আর একটা। আর একটা ধরালে আর একটা। মনটা ফস ফস করে। মেয়েটাকে দেখে এলুম। বয়েস হয়েছে। বেশ শক্ত সমর্থ। খুব ফিট। জড়তা নেই। আঙুলে শাড়ির আঁচল পেঁচাবার লজ্জা নেই। সত্যি কথা বলতে কি, এই প্রথম আমি প্রেমে পড়লুম। মন্ত্রমুগ্ধ ফনীর মতো অবস্থা হল। কথায় কথায় জানলুম, ইনি অ্যামেচার অভিনেত্রী। এক সময় স্পোর্টসে অল্প স্বল্প নাম হয়েছিল। একশো মিটার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ান হতো। আমি বললুম, 'পহন্দ। আমি একটা পয়সাও নেবো না।'

কে একজন বললে, 'দিচ্ছে কে?'

মুখের ওপর এই রকম বলায় খুব রাগ হল। অপমানিত বোধ করলুম। পরে জেনেছিলুম, কথাটা বলেছিল মেয়েটির ভাই। একটা ভেঁপো ছেলে। যাক! আমি তাকে তখনকার মতো ক্ষমা করে দিলুম। সেই প্রথম বুঝেছিলুম, ভালো-বাসা মানুষকে কত উদার করে দেয়। ওই জন্যেই শ্রী চৈতন্য বারে বারে বলেছিলেন, ওরে পাগলা, প্রেম কর, প্রেম কর। ভালোবেসে যা। মেরেছো কলসির কানা,

তা বলে কি প্রেম দোবো না। আমার আগের বিয়েটা শুধুই বিয়ে ছিল। এ বিয়েটা হল প্রেম।

বসে পড়লুম পিঁড়েতে। প্রথম ধাক্কাটা খেলুম শুভ দৃষ্টির সময়। চাদরের তলায় আমার দ্বিতীয়পক্ষ, বলতে লজ্জা করছে চোখ মেরে দিলে। ঠাস করে। কেমন যেন ভড়কে গেলুম। চাদরের তলা থেকে বেরিয়ে এসে পুরোহিত মশাইয়ের অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললুম। তিনি একটু ব্যঙ্গ করেই বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খান খান, আজকালকার বিয়ে আবার বিয়ে! দামড়া দামড়ীর হাত ধরাধরি।' বৃদ্ধ মানুষ। কাঠ খোঁচা চেহারা। শুনে আমার খুব খারাপ লাগল। বাকি সবাই হ্যা হ্যা করে হাসল। আমার মনে তখন উড়ো ঝাপটা একটা গানের কলি ভাসছে, 'বুকে শেল মেরেছে, হৃদয়ে শেল মেরেছে।'

তিন টানে অত বড় একটা সিগারেট শেষ করে বসে গেলুম. যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদহৃং করতে। মেয়েকে কে যে আমার হাতে সম্প্রদান করছেন বুঝতে পারলুম না? মেয়ের হাত আর আমার হাত এক হওয়া মাত্রই, হাতের তালুতে কুড়ু কুড়ু করে দিলে। কোথা থেকে চার পাঁচটা সাঙ্ঘাতিক ফচকে মেয়ে এসে, আমার কান দুটো ধরে আচ্ছা করে মলে দিল। আর চেনা নেই শোনা নেই পাঞ্জাবী পাজামা পরা মহা একটা চ্যাংড়া ছেলে এসে বাসর ঘরে সারা রাত আমার বউয়ের সঙ্গে হ্যা হ্যা করে কাটিয়ে দিলে? মনে হচ্ছিল, আমি বিয়ে করেছি না ওই পল্লবকুমার করেছে? মিনিট পনের-র জন্যে বউকে খালি পেয়ে একটু রাগ রাগ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'ছোঁড়াটা কে?'

বউ বললে, 'তুমি কি এইরকম গেঁয়ো ভাষায় কথা বলো না কি?'

বিয়ের ঘণ্টা চারেকের মধ্যে আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করাটা আমার কাছে ধৃষ্টতা বলেই মনে হল। আমি তো জানি ফুলশয্যার রাতের শেষের দিকটায় অনেক সাধ্য সাধনা করে বউকে দিয়ে 'তুমি' বলাতে হয়। সেই 'তুমি'-তে আলাদা একটা রস থাকে। আমার আবার সেই 'হিট' গানের লাইনটা মনে পড়ছে—'বলি কি বলি না, বলা তো হল না, হায়!'

যাক, বসে আছি বউয়ের এলাকায়, এখানে কান ধরে টানার, চুল ধরে টানার মতো অনেকে আছে। তাই রাগ সামলে বললুম, 'ছোঁড়া, ছুঁড়ী, শব্দটা এমন কিছু খারাপ নয়।'

'ভাষা দিয়ে কালচার বোঝা যায়। দেখি তোমার হাত আর পা দেখি।'

তার মানে? বেশ ঘাবড়ে গেলুম। এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন,

শুনেছি, তিনি পা দেখে ওষুধ দেন। পা দেখে রোগ ঠিক করেন।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'হাত পা দেখবে কেন?'

'কালচার মাপবো।'

সে আবার কি রে বাবা। ফুলপাড় কোঁচার তলা থেকে পা বের করে সামনে রাখলুম।

'হুঁ এ তো দেখছি দামড়া পা। তোয়ালে, সাবানটাবান ওই এরিয়ায় যায়? যায় না! এই ময়লা গোদা পা, তুমি বিছানায় তুলবে? এই পায়ের পাতা দিয়ে তুমি আমার পায়ের পাতা স্পর্শ করবে? ম্যা গেঃ।'

তার সারা শরীর শিউরে উঠল। মনে মনে আমিও ছোট হয়ে গেলুম। পা হল শরীরের স্ট্যান্ড। টেবিলের টপটা নিয়েই লোকে মাথা ঘামায়। পায়া নিয়ে কার মাথা ব্যথা?

'পরশু পা ঠিক করে বিছানায় উঠবে। তা না হলে অ্যালাউ করব না। সারা রাত মাদুর পরে মেঝেতে বসে থাকতে হবে।

আমার সাফ কথা। হাইজিনের ব্যাপারে আমি স্ট্রিক্ট। হাত দেখি, ডান হাতের চেটো।'

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'সিগারেট আমি বেশি খাই না। তুমি যা ভাবছো তা নেই।'

'কি ভাবছি!'

'আঙুলের পাশে নিকোটিনের দাগ। আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তোমার ভাবনা হচ্ছে আর কি!'

'রামো! তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমার ভাবনা হবে কেন। আজকালকার মেয়েরা বিধবা হয় না। এটা তো আমার সেকেণ্ড ম্যারেজ। থার্ডও বলতে পারো। টমকে আমি সেই বোল বছর বয়সেই রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছিলুম। ছ'বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর অলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল পুরী হোটেলে। টমের হিংসে। ছেলেরা তো একটু জেলাস হয়। তা ছাড়া বেশির ভাগ ছেলেই বোকা। টম সুইসাইড করলে। পুওর চ্যাপ। অলোককে ভালো লাগল না। বছর তিনেক খেলিয়ে ছেড়ে দিলুম। বিকাশ এল। বিকাশ ছেলেটা ভালো ছিল। ভালো ইনকাম করত। মিথ্যে বলব না, আমার পেছনে লাখ তিনেক খরচ করেছিল। মোস্ট ট্রাবলসাম ছিল ওর মাটা। বুড়ীটা আমার লাইফ হেল করে দিয়েছিল। বললুম, হয় তুমি মাকে কাশীটাশী কোথায় নড়া ধরে ফেলে দিয়ে এসো, আর না হয় আমার আশা ছাড়ো। রোজ রাতে বুড়ী পাশের ঘরে

অ্যাজমার কাশি কাসবে, এ একেবারে অসহ্য । আমার নার্ভাস ব্রেকডাইন হয়ে যাচ্ছে। ফরাসী দেশ হলে আমি তোমার বিরুদ্ধে বিশলাখ টাকার একটা ক্ষতি-পূরণ মামলা দায়ের করে দিতে পারতুম। এই ব্যাকওয়ার্ড দেশে সেটা সম্ভব নয়। তা সেই মাতৃভক্ত পাঁঠাটা আমাকে ছেড়ে দিলে।'

আমি ভয়ে ভয়ে একটা সিগারেট ধরালুম। হাত কাঁপছে। আমার দ্বিতীয় পক্ষ বললে, 'কি ব্র্যান্ড ?'

মুখ দিয়ে কথা সরল না। প্যাকেটটা তুলে দেখালুম।

'খুব চিপ ব্র্যান্ডের সিগারেট খাও তো ! ভালো সিগারেট থাকলে একটা টান টানতুম। মুখটা কেমন যেন ফ্যাক ফ্যাক করছে।'

'তুমি সিগারেট খাও ?'

'কেন খাবো না ! সেই কলেজ লাইফ থেকেই তো ধরেছি। 'মাঝে হাফ টোব্যাকো ফেলে দিয়ে গাঁজা ভরে খেতুম। এখন সেটা ছেড়েছি। তবে খুব যখন ফ্রাসট্রেশান হয় তখন আবার খাই। বেশ লাগে। আমাদের এই অভিনয় লাইনে মন মেজাজ কখন কি রকম থাকবে বলা শক্ত।'

'তুমি অভিনয় করো না কি ? কই তোমার নাম তো শুনিনি, কোথাও কোন ছবিও দেখিনি।'

'তোমার তো কালচার নেই। আর্ট থিয়েটার কাকে বলে জানো ? ওয়ান ওয়াল কাকে বলে জানো ? কোনও দিন দেখেছো ? আমার নাম শুনবে কি করে ? তোমার দৌড় তো যাত্রা, হাতিবাগানের থিয়েটার, হিন্দি ছবি। কোনও দিন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস কি রবীন্দ্রসদনে গেছ ?'

নার্ভাস হয়ে বলে ফেললুম, 'না ভাই।'

আমার দ্বিতীয়পক্ষ ভেঙচি কেটে বললেন, কেন ভাই ?'

শেষে মরিয়া হয়ে বলে ফেললুম, 'আমারও কিন্তু মা আছেন।'

'নো প্রবলেম, আমি ঢুকলেই বুড়ি বেড়িয়ে যাবে। সে আমি দাওয়াই দিয়ে দেবো। ও তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। বলে কি ! শেষে আমি মিন মিন করে বললুম, ধরো আমি তোমাকে বিয়ে করি নি।

'অত সহজ নয়। ধরতে হলে সঙ্গে অন্য জিনিস ও ধরাতে হবে। ব্যাপারটা তো কোর্টে চলে যাবে। শুনেছি তোমার বাড়ি আছে। বাড়িটা লিখে দাও, আর পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্যাশ ডাউন করো। তাহলে তোমার ওই ধরাটা ধরা যাবে।'

আমি গোটাকতক ঢোঁক গিললুম। এ তো দেখি আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়ে

গেলুম। বললুম, 'ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিয়ে করা উচিত নয়। সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।'

'কেন? রথের যদি উল্টো রথ হয়, সংসার পুরাণের উল্টো পুরাণ হবে না কেন! ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখোনি। আমি তো রাত বারোটার সময় মাল খেয়ে টলতে টলতে ফিরবো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার নাম ধরে চেঁচাবো ভোমলা, ভোমলা। তারপর ঢুকেই তোমাকে পেটাবো। জাস্ট উল্টে নোবো গুরু। ভোর বেলা জড়ানো গলায় বলবো, অ্যায় লেবু চা লে আও। কি? ভয় পেয়ে গেলে মাইরি! বুমেরাং শুনেছো, বুমেরাং।' আমার দ্বিতীয়পক্ষ রাজিয়া সুলতানার মতো হাসতে লাগল। হঠাৎ হুলু লুলু, হুলু লুলু করে উলুর শব্দে চমকে উঠলুম। 'কি হচ্ছে? কিসের আওয়াজ?' আতংক। দ্বিতীয়পক্ষ বললে, শেয়াল কাঁদছে ভাই। যেখানে যত শেয়াল ছিল সব এক সঙ্গে কেঁদে উঠল ভাই। তোমার মা এখন কার গালে ঠোনা মারবেন ভাই। তুমি এখন কাকে ময়দা ঠাসা করবে ভাই। ভয় পেলে মানুষের সাহস বাড়ে। আমি আদি অকৃত্তিম স্বামীর ভাষায় ন্যাকা ন্যাকা গলায় বললুম—'হ্যা গা, এ কি তোমার অভিনয়!'

bathagar.net

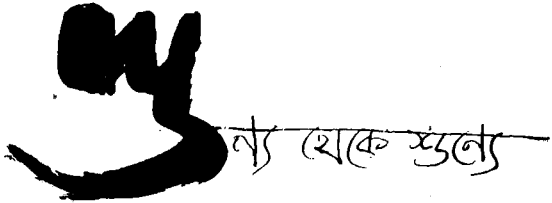

আর তো পারা যায় না, তিরিশ বত্রিশ বছর ধরে এক নাগাড়ে চাকরি করেই যাচ্ছি। করেই যাচ্ছি। রোজ সকালে ওঠো। এক কাপ পাঁচন গেলো। বাজার করার থলিটা হাতে নাও। বেরিয়ে যাও বাজারে। গুঁতো গুঁতি। ঠ্যালা ঠেলি। যেন ফ্রি-স্টাইল কুস্তির আখড়া। থলেটার তলার দিকের সেল্যাই খুলে গেছে। বাড়িতে কারুর ছুঁচ ধরার সময় নেই। হাত যেন উত্তাল নদীতে সংসারের হাল ধরে আছে। হাল ছেড়ে এক মুহূর্ত ছুঁচ ধরলে নৌকো ডুবে যাবে। সুতরাং ড্যাবা ড্যাবা দুটো সেফটিপিন লাগানো আছে। আলুপটল গায়ে গতরে জিনিস। গলবে না। কড়াই শুঁটি কি ছোট মাপের উচ্ছে গলে যাবে। কোনও রকমে বাজারটা সংসারের চাক্তিলে ফেলে দিয়ে দাড়ি কামাও। তিরিশটা বছর ধরে উল্টোপাল্টা টান মেরে দাড়ির কি অবস্থা! যেন এলোমেলো পিন কুশান। সিঙ্গল ব্লেড, ডবল ব্লেড, বিলিতি ব্লেড, সবই ফেল মেরে যায়। মসৃণ গোলাপী গাল আর বেরোয় না। অবশ্য গাল বলে আর কিছুই নেই। দু'পাশে দুটো গর্ত। কোনও সুন্দরী যদি ক্ষমা ঘেন্না করেও হঠাৎ একটা চুমু খেতে চায়, তাহলে বলতে হবে, সুন্দরী, ওয়েট এ মিনিট। গালটাকে গজিয়ে নি। বাতাস পুরে ফুলিয়ে নি।

তারপর হুড়হুড় চান। ভালো করে গা মোছারও সময় নেই। নটা পনেরো মিস করবো। প্যাঁক প্যাঁক গিলেই দে দৌড়। ঘামতে ঘামতে, হাঁপাতে হাঁপাতে, অফিস নামক সেই গারদে। আর পারা যায় না মা! এবার মুক্তি দে। ট্যাঁকের জোর থাকলে কবেই এই ছ্যাঁচড়া জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতুম। ভাবা যায় জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা জলের দরে বিকিয়ে গেল! সকালটা দেখার উপায় নেই। দুপুরটা মুখ থুবড়ে ফাইলের গাদায়। সন্ধেটা বাসের ভিড়ে। আর রাত! রাতে তো সারাদিনের ক্লান্তিতে হাঁ। আর রাতে মানুষের করারই বা কি থাকে, দেখারই বা কি থাকে! সবই তো অন্ধকারের কম্বলে মোড়া। ঝাপসা ঝাপসা গাছপালা। ঢ্যাপসা ঢ্যাপসা বাড়ি আর আকাশ ভরা তারা। কখনও সেখানে ক্ষেয়ো চাঁদ। কখনও আসরে পূর্ণ চন্দ্র। কখনও ল্যাপা মোছা মেঘ। বিদ্যুতের দেঁতো ঝিলিক। দিনের শোভা তো সকাল, দুপুর, বিকেল। সেই তিনটে সময়ই জীবিকার ধান্দায় পড়ে রইল জীবনের বাইরে। আসে যায়, তাকাবার সময় নেই। কি পরাধীনতা।

আমার ইচ্ছে করছে, আহা, এমন সুন্দর সকাল, আমি এখন গঙ্গার ধারে গিয়ে ছোট ছোট ঢেউয়ের ওপর রোদের কাঁপন দেখবো। উপায় নেই অফিস। অফিসে বসে মনে হচ্ছে, আহা এমন সুন্দর রোদে ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে, বেশ ফাঁকা মাঠে গাছের ছায়ায় বসে ক্লান্ত পাখির ডাক শুনবো। উপায় নেই অফিস। ইচ্ছে করছে দিবা দ্বিপ্রহরে টকের ডাল, নিম বেগুন ভাজা, চারা মাছের ঝাল দিয়ে এক পেট ভাত খেয়ে, দোতলার ঘরে উত্তরের জানালার ধারে নিপাট সাদা বিছানায় শুয়ে, নীল আকাশ আর ঝিরি ঝিরি সবুজ পাতা দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে ঘুমের কোলে চলে যাবো। উপায় নেই। চাকরি।

তেমন একটা মোটা মাইনের চাকরি হলে, এই সব আত্মবিসর্জন পুষিয়ে যেত। মনকে তবু বোঝাতে পারতুম যাক গে মন, বশে থাকো, মাসের শেষে কড়কড়ে এক বাণ্ডিল হাতে আসছে। গুণে শেষ করতেই আধঘণ্টা সময় লাগে। এই নাও তুমি তন্দুরি চিকেন খাও। মেওয়া খাও। সুরাপান করো। ফ্রুট জুস খাও। মন, দামী দামী জামা কাপড় পরো। সুন্দর করে ঘর সাজাও পৃথিবীর কোনও ধনী মানুষ, আকাশ বাতাস, গাছপালা, পশুপক্ষী, চাঁদ তারার জন্যে লালায়িত নয় মন। তুমি কেন দুঃখ করছ। কেরিয়ার, অর্থ আর ভোগ এই হল সব।

তা যার ধরো নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তার এ কুল ও কুল দু কূলই গেল। বাইরে বিদ্রোহ হলে গুলি চালিয়ে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যায়, ভেতরে বিদ্রোহ হলে মানুষ কি করবে। ভেতরটাকে তো আর ডিভোর্স করা যায় না। বিষণ্ণ বলদের

মতো দিন কাটাই, আর ভাবি আসছে বার কিছু না পারি, নিদেন একটা স্মাগলার হয়ে জন্মাব। আজ হংকং কাল হনুলুলু, পরশু আর্জেন্টিনা, তরশু টোকিও। এক একদিন এক এক রকম জীবন। ভিয়েনায় পূর্নিমা, দিল্লিতে অমাবস্যা। মেকসিকোয় সমুদ্রস্নান, ক্যালিফোর্নিয়ায় লাঞ্চ।

আমি রোজ রাতে বিছানায় গ্যাঁট হয়ে বসে ঈশ্বরকে ডাকি। মাথায় ঠেকে আছে মশারির চাল। অন্ধকার ঘর। আমি হাত জোড় করে আকুল হয়ে ডাকি—ভগবান। মুক্তির একটা পথ দেখাও। ভগবান দেশ স্বাধীন হয় মানুষ কেন স্বাধীন হতে পারে না। তুমি একটা পথ করে দাও আমাকে। আমি যাতে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াতে পারি ধর্মের ষাঁড়ের মতো। যা খুশি তাই করতে পারি মা। মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়া, বউয়ের গেঁটে বাত, শেষ জীবনের শত চিন্তা থেকে এইবার অব্যাহতি দাও মা। আমি তো আমার ইচ্ছেতে আসিনি, তোমার ইচ্ছায় এসেছি। আমি তোমারই পাঁঠা মা। তুমি ন্যাজে কাটলে ন্যাজে কাটবে, মুড়োয় কাটালে মুড়োয়। তবে আমারও তো কিছু বলার আছে! তোমার ম্যাও এবার তুমি সামলাও। হাত জোড় করে এই সব বলে টলে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। জানি ঈশ্বর সকলের ডাকে সাড়া দেন না, তবু আমি বলি।

আমার সহকর্মী সদানন্দের বড় মেয়ের বিয়ে। যাক অনেক চেষ্টার পর ভালো একটি পাত্র পেয়েছে। অনেক টাকার ধাক্কা। তা হোক। বিয়ে তো দিতেই হবে। সোদপুরে সদানন্দর বাড়ি। যেতেই হল। একটা শাড়ি বগলদাবা করে চলে গেলুম। বেশ স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন ছিল রবিবার। যা হয়, খাওয়া দাওয়ার পাট চুকতে বেশ দেরি হয়ে গেল। তারপর আরও যা হয়, ফেরার গাড়ি পেলাম না। তখন মনে হল কিছুটা হাঁটা যাক। হাঁটলে হজম হবে। ভরপেট খাওয়া হয়েছে।

রাস্তার একপাশ দিয়ে দিয়ে টুকটুক করে হাঁটছি। কোথাও অন্ধকার, কোথাও আলো, কোথাও অধারী। এদিকটা একটু পাড়াগাঁ, পাড়াগাঁ। রাস্তার দু পাশে গভীর কাঁচা ড্রেন। ঝোপ ঝাড়। রাত হয়েছে। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই হয়। একবার উল্টোদিক থেকে দুটো লোক মাথায় সাইনবোর্ড নিয়ে হন হন করে আমাকে পেরিয়ে চলে গেল। তার অনেক পরে আর একটি লোক পাশ দিয়ে বলতে বলতে গেল—শুয়োরের বাচ্ছা আমাকে ভোগা দিয়ে গেল। বার বার এই একই কথা বলতে বলতে সে বাঁ পাশের একটা গলিতে ঢুকে গেল।

আমি হাঁটছি। হেঁটেই চলেছি। হাঁটার একটা নেশা আছে তো! ছন্দ আছে। ডান বাঁ, ডান বাঁ। সামনেই একটা আলো আঁধারী জায়গা। ওইটুকু

পেরোলেই বড় রাস্তা। আর বড় রাস্তায় পড়তে পারলেই গাড়ি ঘোড়া যা হয় একটা কিছু পাওয়া যাবে। আমার বেশ মনে আছে আমি রাস্তার বাঁ দিক ধরে হাঁটছিলুম। এদিকটায় নর্দমা ছিল না। এবরো খেবড়ো রাস্তা। মেরামত হবে বলে কিছু খোওয়া আর পাথর গাদা করা ছিল। সারাটা পথে এইখানেই একটা ল্যাম্পপোস্ট দেখলুম। আলোটা জ্বলছে। আমাদের পরাধীনতার স্মৃতি। স্বাধীন ভারতে রাস্তায় আলো জ্বালার বিধান নেই। হেলথগ্রাউণ্ডে। অন্ধকারের চোখ ভালো থাকে।

পাথরের গাদার ওপর আলোটা পড়েছে, আর সেখানে দেখি সুন্দর লাল মতো একটা পুঁটলি পড়ে আছে। অনেকটা গেঁজের মতো। অনেক অনেক আগে সেষ্ঠী বা ধনকুবেররা এই রকম সুদৃশ্য থলিতে মোহর টোহর রাখত। সিল্কের ফাঁস টানা। জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। এপাশে ওপাশে তাকালুম। না কেউ কোথাও নেই। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। কালো ভোদকা মতো একটি কুকুর নেচে নেচে এলো, এসে ঠ্যাং তুলে ল্যাম্প পোস্ট সেচ্ছায় করে পালালো।

মনটা ভেঙে দু খণ্ড হয়ে গেল। একটা মন বলছে, তুলে নিয়ে নাও। আর একটা মন বলছে, লোভ সামলে। দুটো মনে দাঙ্গা বেঁধে গেল। এ বলে, তুলে নে, ও বলে তুলিস নি। শেষে নেতিবাচক মনটা হেরে গেল। আসলে পৃথিবীটাতো ইতিবাচক। নাস্তি নয়, অস্তি। আমি আছি, আমার সামনে আছে লাল পুঁটলি। আমার হাত আছে। হাতের কাজ ধরা। ধরে তোলা।

পুঁটলিটা টক করে তুলে নিয়ে হাঁটা ধরলুম। মসৃণ ভেলভেটের থলি। মোটামুটি মনে হল মোহর টোহর নেই পাথর কুঁচিটুচি হবে। কোনও বদমাইশ ছেলের লোকঠকানো কারবার। তবু থলিটা পাঞ্জাবির পকেটে ভরে রাখলুম। মানুষের অপরাধ বোধ বড় মজার জিনিস। থলিটা ধরা মাত্রই মনে হচ্ছে—আমি একটা চোর। বারে বারে, পেছন ফিরে তাকাচ্ছি। কেউ দ্যাখেনি তো। দেখে ফেলে নি তো। দুপা এগোই পেছন ফিরে তাকাই। বুকের বাঁ পাশ টিপ টিপ করছে।

বড় রাস্তায় এসেই একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি পেয়ে গেলুম। কলকাতার দিকেই যাচ্ছে। একেই বলা চলে বরাত। মানুষের কি রকম কুসংস্কার। মনে হল, আমার বরাত তো এই রকম নয়। আমার তো সব কাজেই বাধা পড়ে। হঠাৎ কি হল? এ কি ওই লাল পুঁটলির কৃপা?

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কোনও রকমে দরজা খুলে দিয়ে সবাই

শুয়ে পড়ল। আমি সেইটাই চাইছিলুম। ভেতরটা হাঁকপাঁক করছে। কখন নির্জনে বসে লাল ভেলভেটের থলিটা খুলবো? নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলুম। খাটের মাঝখানে লাল থলিটা রাখলুম। পাঞ্জাবিটা কোনও রকমে খুলে হ্যাঙ্গারে? আমার আবার এই সব খুব আছে। টিপটপ। যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে গোছগাছ করে তবে অন্য কাজ। সে যতই প্রলোভন থাক না কেন। কাচা একটা পাজামা পরলুম। গেঞ্জিটা পালটালুম। খবরের কাগজটা জানলার ধারের টেবিলে ছিল, বাতাসে এলোমেলো হয়ে গেছে। সেটার ভাঁজ ভাঁজ মিলিয়ে পাট করে রাখলুম। এই সব করছি, আর মাঝে মাঝে লাল থলিটার দিকে তাকাচ্ছি। কি আছে ভেতরে কে জানে? মনে হচ্ছে, ছুটে গিয়ে খুলে ফেলি? ধরে রেখেছি নিজেকে। একেই বলে সংযম? সব শেষে এক গেলাস জল খেলুম? ট্যাং ট্যাং করে দুটো বাজল।

সব দরজা জানলা বন্ধ করে একটা ধূপ জ্বালালুম। এইবার বিছানার মাঝখানে বসে থলিটা খুলবো। বুকের ভেতরটা কেমন করছে। স্ট্রোক না হয়ে যায়? থলির মুখের দড়ির ফাঁসটা আলগা করে বিছনায় উপুড় করে দিলুম। স্তম্ভিত। চোখ ছানাবড়া। এ কি? এমনও হয়।

ঝকঝকে সাদা আর লাল লাল পাথর। আলো পড়ে ঝিলিক মারছে। হীরে না কি? লালগুলো মনে হয় চুনী। উঠে গিয়ে আর এক গেলাস জল খেলুম? বুক ধড়ফড় করছে। মরলে চলবে না। আমাকে যেভাবেই হোক বাঁচতে হবে। এখন মরলে চলবে না। ভগবান মনে হয় আমার প্রার্থনা শুনেছেন। পাখার গতি বাড়ালুম। হাত জোড় করে ভগবানকে বললুম—জীবনের মোড় যখন ঘুরিয়েই দিলে তখন দুম করে মেরে দিও না প্রভু। তুমিও যেমন আছো, আমাকেও তেমনি থাকতে দাও?

সাদা পাথর আর লাল পাথর গুনে গুনে আলাদা করলুম। সাদা আছে কুড়িটা। বেশ বড় বড়। আর লাল, এক একটা বেদানার দানার মতো। একশো আটটা। এই ধরনের চুনীকেই বলে পিজিয়ন্স ব্লাড। জমাট বাঁধা পায়রার রক্ত। হীরেও দামী, চুনীও দামী। এইবার আমার মাথাটা না খারাপ হয়ে যায়। কারণ মনে মনে আমি বারেবারেই বলতে শুরু করেছি—এমনও হয়, এমনও হয়?

হঠাৎ সন্দেহ হল, হীরে তো! না কাঁচ। পরীক্ষা করা দরকার। হীরে কাঁচ কাটে। দাড়ি কামাবার ছোট্ট আয়নাটা দেয়াল থেকে পেড়ে আনলুম তারপর বেশ বড় সাইজের সাদা একটা পাথর দিয়ে টানতেই কড়কড় করে কেটে গেল।

আনন্দে ভেতরটা এমন লাফিয়ে উঠল, মনে হল হার্টটা ছিটকে বিছানায় না পড়ে যায়? সারাটা রাত ধরে আমি আমার বহুদিনের সঙ্গী সেই দাড়ি কামাবার আয়নাটাকে হীরে টেনে টেনে ফালা ফালা করে ফেললুম। তাকালে নিজের একটা মুখ নয় একশোটা মুখ দেখতে পাচ্ছি।

মনি মানিক্য নিয়ে অনেকক্ষণ খেলা করার পর ভবিষ্যৎ একটা পরিকল্পনা ঠিক করে ফেললুম। ছকে ফেললুম? ব্রাসেলস না অ্যামস্টারডামে জুহরীদের একটা বাজার আছে। সেইখানে আমি যাবো। গিয়ে হীরে গুলো সব বেচে দেবো। কলকাতার বড়বাজারে আমি যাচ্ছি না যাবো না? ভালো দাম তো পাবই না, উল্টে পেছনে টিকটিকি লেগে যাবে। ইনকাম ট্যাক্স লেগে যাবে?

কিন্তু ব্রাসেলসে যাবো কি করে? অনেক টাকার ধাক্কা? হীরে না বেচা-পর্যন্ত তো আমি সেই আমি। নুন আনতে পান্তা ফুরনো আমি। শুনেছি বোম্বেতে একটা বিশাল ডায়মণ্ড মার্কেট আছে। বোম্বেতেই যাবো। দু চার-পয়সা দাম কম পাই ক্ষতি নেই।

পরের দিন সকালে আয়নায় তাকিয়ে দেখি চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। গাল আরও বসে গেছে। সারা রাত না ঘুমোলে যা হয়। মনে মনে বললুম, ঠিক আছে। শরীর আর কটা দিন অপেক্ষা করো তারপর চেকনাই কাকে বলে দেখবে। ফলের রস খাওয়াবো, মুর্গমসল্লম খাওয়াবো, মাঝে মধ্যে বিরিয়ানী, রাত্তিরে মেপে এক ডোজ বিলিতি। মুশকিল হল বড়লোকরা কি করে, কি খায় আমার তেমন জানা নেই। মটোর গাড়ি চড়ে এইটুকু জানি আর একদম হাসে না, মুখটা সব সময় গোবদা মতো করে রাখে, আর খুব হিসেবী হয়। আর খুব গরীব হয়। আমাদের পাড়ার একজনের উপকারে আমরা সবাই চাঁদা তুলতে বেরিয়েছিলুম তা বিশাল এক ধনী মানুষের বাড়ী যেতে তিনি অনেক নাকে কেঁদে আমাদের পাঁচটি টাকা ঠেকিয়েছিলেন। আমরা তো অবাক, সে কি মশাই, আপনি পাঁচ, ফাইভ ইনটু টেন অন্তত করুন। তাতে তিনি বলেছিলেন, ভাই আমার কাছে পাঁচের বেশি নেই, আমার যা দিন যাচ্ছে! আমার সবই তো হয় ফিকসড করা, না হয় ইনভেস্ট করা পাঁচের বেশি আমি পাই কোথা থেকে। তা তখন আমরা সেই ময়লা পাঁচ টাকার নোটটা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলুম—রাখুন, আহা, আপনার এই কপর্দক শূন্য অবস্থা আমাদের জানা ছিল না। বিড়িটিড়ি কিনে খাবেন? এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো তাঁর কর্মচারী। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে চেপে ধরলেন, কালকের হিসেবের দশটা পয়সা তো তুমি আমাকে দিলে না।

আমি তিনটে দিন রাজারটাকে একটু বাজিয়ে নিলুম? আমার এক সহকর্মীকে

জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা, বলতে পারেন, এখন একটা হীরেন দাম কত পড়তে পারে। তিনি ফাইল থেকে মুখ তুলে বললেন, খুব লোককে জিজ্ঞেস করেছেন যা হোক। যে কাঁচের দাম জানে না, তাকে জিজ্ঞেস করছেন হীরের দাম। আমার স্ত্রীর খুব সাধ ছিল হীরের নাকছবি পরবে? মেয়েটা বড় ভালো মশাই। জীবনে তো কিছুই পেলে না। আমাকে বিয়ে করে গোটাকতক ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কিই বা পেয়েছে। তাই ভাবলুম যাক, ইচ্ছে যখন হয়েছে চেষ্টা করে দেখাই যাক। গেলুম এক গয়নার দোকানে, অমশাই প্রথমে মিনিট পাঁচেক আমাকে দেখলে। তারপর বারে বারে বলতে লাগল, হীরে! হীরের নাকছাবি! আমি বললুম, অমন করছেন কেন? হীরের নাকছাবি হয় শোনেন নি!

ভদ্রলোক ব্যাঙ্গের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, জিরে দেখেছেন? জিরে?

কেন দেখব না?

জিরের মাপের একটা আসল হীরের দাম দশ থেকে বারো হাজার। আর তিল দেখেছেন? তিলের মাপের একটা হীরের দাম ছ' থেকে সাত হাজার টাকা।

ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে দোকান থেকে বেরিয়ে এলুম। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। সারা জীবনের সঙ্গীকে একটা জিনিস দিতে পারলুম না। এত আশা করে চাইলে! বছরের পর বছর কলম ঘষে এই আমার সঙ্গতি! বিশ্বাস করুন, আমার চোখে জল এসে গেল। একটা ব্যবসাদারের ছেলে একশো টাকা টিপস দেয় আর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. দশটা ইণ্টারভিউ দিয়ে চাকরি, ছটা ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিয়ে প্রোমোশান, আমার ব্যাঙ্ক রেস্তো সাতহাজার তিনশো টাকা চল্লিশ পয়সা। সেদিন আমি টানা দু ঘণ্টা স্ট্র্যাণ্ড-রোডের গঙ্গার ধারে একা বসে রইলুম। শেষে কি ভাবলুম জানেন, শুনলে হাসবেন, আমাদের হীরে আমাদের চোখেই আছে, চোখের জল।

আমার সহকর্মীর দুঃখের কথা শুনে মুখটাকে যতদূর সম্ভব করুণ করুন করলুম। অন্য সময় হলে হয়তো অন্তরস্পর্শ করত। আমি নিজে হীরের মালিক। একটা নয় দুটো নয় বিশটা। এক একটার সাইজ কি! আকাশ থেকে যে শিলাবৃষ্টি হয়, এক একটার সাইজ ঠিক সেই শিলের মতো। কি তার জেল্লা। কালো একটা কাপড়ের ওপর সেদিন ছড়িয়ে দিয়েছিলুম, একেবারে জ্বলজ্বল করছে? আহা কি যে রূপ তার?

ফিনফিনে একটা ধুতি পরলুম। সিল্কের পাঞ্জাবি। সোনার বোতাম। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। কানে আতর। মুখে আবার একটু পাউডার

ঘষে নিলুম। তারপর ঘণ্টা হিসেবে একটা লাক্‌সারি ট্যাকসি ভাড়া করে চলে গেলুম কলকাতার সবচেয়ে বড় জুয়েলারের ঘরে। হাতে সিল্কের রুমাল। আলতো করে ঠোঁট মুছতে মুছতে দোকানে ঢুকলুম। মালিক খুব খাতির করলেন। জানতুম করবেন। পোশাকের কদর সভ্য মানুষ জানে। আর আমি জানি, জাত বড়লোকেরা কি ঢঙে কথা বলে? আস্তে, ধীরে, চিবিয়ে চিবিয়ে।

আমি বললুম—হীরে।

হীরে?

বড় দোকান। তার ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। দোকানের ভেতর দোকান। অনেকটা গর্ভগৃহের মতো। "বোতাম টিপতেই বৈদ্যুতিক দরজা খুলে গেল। একটা স্টিল প্লেটের ওপর দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলুম। বেশ বুঝতে পারলুম মেটাল ডিটেকটারের ভেতর দিয়ে যেতে হল। মনে হয় একসরে ডিটেকসনিও হয়ে গেল।

ভেতরটা একেবারে রহস্যপুরী যেন? সারা ঘরে চাপা একটা আলো। জায়গায় জায়গায় আলোর ফোকাস! যাঁরা ঘড়ি মেরামত করেন, তাঁরা যেমন চোখে ঠুলি পরেন, সেই রকম ঠুলি পরা এক সার কর্মচারী এক একটা ফোকাসের তলায়। প্রত্যেকের সামনেই এক একজন ক্রেতা। সাংঘাতিক সুন্দরী এক মহিলা, মনে হয় রানীটানী হবেন একের পর এক জড়োয়ার হার পরছেন, আয়নায় দেখছেন, আর খুলে খুলে রাখছেন। সে এক দৃশ্য? বড়লোকদের জগৎটা কি সুন্দর! সুর, সুরা, সুন্দরী মহিলা, হীরে, চুনী, পান্না।

হ্যাঁ বলুন, কি ধরনের হীরে চান? গোল না চৌকো, সাদা না হলদে?

প্রশ্ন শুনে প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেলুম। কত রকমের হীরে আছে! যাক ঠিক সময়ে নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিলুম। পকেট থেকে নরম কাগজে মোড়া আমার হীরেটা বের করলুম। তারপর মোড়ক খুলে তাঁর সামনে মেলে ধরে বললুম, এইটা দেখুন।

ভদ্রলোক চোখে ঠুলি লাগিয়ে দু আঙুলে হীরেটা চোখের সামনে তুলে ধরলেন? অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললেন, অসম্ভব দামী হীরে। এতকাল আমরা ব্যবসা করছি, এমন জিনিস দেখিনি। এ একেবারে জেনুইন সাউথ অ্যাফ্রিকান মাল?

কত দাম হবে?

হীরের তো ও ভাবে দাম হয় না। অকসান হয়। নিলামে যেমন দাম উঠবে। তা ধরুন দশ, বিশ, বাইশ লাখ পর্যন্ত দাম উঠতে পারে।

জিনিসটা আমি বেচতে চাই।

তাহলে আপনাকে বোম্বাই যেতে হবে। জহুরী বাজারে। সেখানে চিমনলাল সব চেয়ে বড় অকসানার।

আপনি সেখানে চলে যান? কলকাতায় এ জিনিস কেনার মতো লোক নেই।

কেন আপনারা?

আমরা মশাই অ্যামেরিকান হীরে আর হীরের ছাঁট বিক্রি করি। আমরা হলুম গিয়ে হাজারের কারবারী। লাখে এখনও উঠতে পারিনি?

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলুম। গাড়ি ভাড়া একশো কুড়ি টাকা বেরিয়ে গেল। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবলুম ব্যাপারটা যত সহজ হবে ভেবেছিলুম তা হবে না। বড়লোক হওয়া মোটেই সহজ নয়। ভগবান তুমি যদিই বা দিলে তা এই ভাবে দিলে কেন? নগদ দিলে পারতে। পরে ভাবলুম তা কি করে হয়। কেউ একটা থলিতে ভরে তিনি আমাকে যা দিয়েছেন তার দাম দশ বারো কোটি টাকাও হতে পারে। এই টাকা নগদে দিতে হলে বিরাট একটা বস্তা পথের পাশে ফেলে রাখতে হত। অ্যাবসার্ড। ভগবান কি আমার মতো গাধা! তিনি এই জগৎ সংসারের রাজা রে বাবা।

থলিটা পাবার পর থেকে রাতে দু চোখের পাতা এক করতে পারি না। পরিবার পরিজনের সঙ্গে ভালো করে মিশতে পারি না। তারা ভাবছে লোকটার হঠাৎ কি হল পাগলটাগল হয়ে গেল না কি! সব সময় অন্যমনস্ক। সাতবার ডাকলে একবার উত্তর মেলে। শুকনো চেহারা। লাল চোখ। উদভ্রান্ত। আমরা বলছি এক শুনছে আর এক।

একদিন আমার বউ বললে, তোমার কি হয়েছে বলো তো?

কই কিছু হয়নি তো।

নিশ্চয় হয়েছে। অফিসে কোনও গোলমাল চলছে না তো?

না, অফিসে আবার কি গোলমাল হবে। করি তো কেরানীর কাজ।

তুমি অবশ্যই আজ আমার সঙ্গে ভাক্তারখানায় যাবে। তোমাদের ফ্যামিলিতে পাগলের ইতিহাস আছে। আমার ভয় করে বাপু।

পাগলের ইতিহাস মানে?

তোমার বড় বোন পাগল হয়ে গিয়েছিল।

সে কি ইচ্ছে করে হয়েছিল। হয়েছিল স্বামী আর শাশুড়ীর নির্যাতনে।

আমিও তো তোমাকে সারা জীবন অনেক নির্যাতন করেছি!

আরে তোমার নির্যাতন আর সে নির্যাতনে অনেক তফাৎ!

BanglaInternet

কিছুতেই যে বলতে পারছি না, আমার প্রবলেমটা কি? চালাকি ব্যাপার। লোকে লাখোপতি হয়, কোটিপতিও হতে পারে। আমার মতো এমন কোটি কোটি কোটিপতি হতে পারে। আমি ইচ্ছে করলে এখন প্রশান্ত মহাসাগরে ছোটখাট্টো একটা দ্বীপ কিনতে পারি। একটা হেলিকপ্টার কিনতে পারি। আমি কি যে না করতে পারি। কেবল একটাই সমস্যা টাকাটা পাথর হয়ে আছে। কোনও রকমে ভাঙ্গাতে পারলেই মার দিয়া কেল্লা। সেই কেল্লাটা মারি কি করে! ব্যাপারটা তো সহজ নয়।

আগে সকাল হলেই সাত তাড়াতাড়ি অফিস বেরবার একটা তাগিদ বোধ করতুম। এখন মনে হয় কেন বেরবো। কি কারণে বেরবো। আমার যা আছে সাত পুরুষ ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে খেতে পারবে। আমার আর কি দরকার গোলামির! পদত্যাগ পত্র লেখা হয়ে গেছে, মাননীয় মহাশয়, নিতান্তই ব্যক্তিগত কারণে আমি চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছি। আমার পদত্যাগপত্র অনুগ্রহ করে বিবেচনা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দায়িত্ব ভার থেকে মুক্তি দিলে বাধিত হব। বিনীত ইতি।

এত বিনয়ের প্রয়োজন ছিল না। আজকাল কেউ চাকরি ছাড়তে চাইলে আনন্দ। আনন্দের হিল্লোল ওঠে। সব চাকরির জন্যে লাইন দিয়ে আছে। তুমি ছাড়লেই আর একজন এসে বসবে। সে বিয়ে করবে, সংসারী হবে। ফ্ল্যাট কিনবে। ছেলেকে ইংলিশ স্কুলে পড়াবে। ছুটি নিয়ে সপরিবারে পাহাড়ে বেড়াতে যাবে।

আমি একাই বোম্বে চলে এলুম। কিছুই চিনি না। কাউকে জানি না। একটা হোটেলে উঠেছি। বেশ ভালই চার্জ। বোম্বে বড় সাংঘাতিক জায়গা। সঙ্গে একটি মাত্র হীরে এনেছি। ঘুণাক্ষরে কেউ যদি জানতে পারে আমি হীরা-পতি, হোটেলের বিছানাতেই মেরে ফেলে রেখে যাবে। স্মাগলার, ব্ল্যাকার, স্পাই, এজেন্ট, কেজিবি, সি আই এ সব থিকথিক করছে এই আরব সাগরের কুলে।

তিন দিন ফ্যাল ফ্যাল করে বোম্বাই শহরে ঘুরে বেড়ালুম। জহুরী বাজারেও গেলুম। গেলে কি হবে। সেখানে সমস্ত মানুষের চাল চলন এমন সন্দেহজনক ভয়ে ফিরে এলুম। বেশির ভাগ লোকেরই চোখে রঙীন চশমা। সরু সরু গোঁফ। ছুঁচলো মুখ। কারুর কারুর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। একটা করে ব্রিফ কেস হাতে নিয়ে একবার এ ঘরে ঢুকছে, একবার ও ঘরে। পুরো এলাকাটাই যেন ভয়ে ভরা। যারা ঘোরাঘুরি করছে তারা কেউই সোজা লোক নয়। আমাকে অচেনা মানুষ দেখে অনেকেই ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। সাদা জোব্বা পরা ধারালো

চেহারার এক সিন্ধী ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে পড়লেন আমার সামনে। বেশ ভয় পাওয়ানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আমি ভয়ে ভয়ে গুণগুণ করে গান গাইতে শুরু করলুম। যেন গান গেয়ে পথে পথে ঘোরাই আমার কাজ।

পকেটের হীরে পকেটে নিয়েই কিছু অর্থদণ্ড দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলুম। শুনেছি বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, হীরে ছুঁলে দেখি সর্বাঙ্গে ঘা। প্রায় পাগল হয়ে যাবার মতো অবস্থা। সাপের ছুঁচো গেলা আর কি? না পারছি ওগরাতে, না পারছি গিলতে। সব সময় দুশ্চিন্তা। এই বুঝি পুলিশ এল বাড়িতে। এই বুঝি ডাকাত পড়ল বাড়িতে। সে ভাবে লুকোতেও পারছি না। রোজই জায়গা পাল্টে পাল্টে রাখছি। যখন অফিসে থাকছি তখন কেবলই মনে হচ্ছে, বাড়ির লোক এটা ওটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে সন্ধান না পেয়ে যায়।

হঠাৎ খুব একটা গোপনীয় বই হাতে এল। কি ভাবে কালো টাকা, সোনার বিস্কুট, হিরোইন, হাসিস লুকিয়ে রাখতে হয়। প্রথম পদ্ধতি হল, যে কোনও একটা দেওয়ালের ভেতর এখানে ওখানে পকেট তৈরি করো। ছোট, ছোট, ঘুলঘুলি। তার মধ্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে রেখে, প্ল্যাস্টার করে' দাও। দ্বিতীয় পদ্ধতি, খাটের যে কোনও একটা পায়া ফাঁপা করে' তার মধ্যে ভরে রাখো। তৃতীয় পদ্ধতি, একটা মোটা বইয়ের অনেকগুলো পাতা এক সঙ্গে চৌকো করে কেটে ফেলে দিয়ে ফোকর বের করো। সেই ফোকরে মাল ভরো? তারপর অনেক বইয়ের মধ্যে সেই বইটা রেখে দাও। চতুর্থ পদ্ধতি, একটা বাথরুম তৈরি করো। সেখানে একটা কমোড বসাও। বাথরুম অথবা কমোড কোনওটাই ব্যবহার করবে না। কমোডের বেদীটা হবে ফাঁপা। সেই জায়গায় সব ভরে রাখো। পঞ্চম পদ্ধতি, ভেন্টিলেটারে, ভেন্টিলেটারের তলার দিকে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পরপর সাজিয়ে রাখো। ষষ্ঠ পদ্ধতি, ঠাকুর ঘরে ফাঁপা শালগ্রাম শিলা 'রুপোর সিংহাসনে লাল কাপড় ঢাকা। প্রত্যেকটি শিলার মধ্যে মাল। জোড়ের মুখটা ঢেকে দাও রুপোর পইতে দিয়ে। বইটা বড় মজার! এইরকম গোটা কুড়ি পদ্ধতি দেওয়া আছে। লেখা আছে, গোপন প্রচারের জন্যে। পড়ার পর নিজের স্বার্থে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলুন। আমিও তাই করলুম। বইটা আমার কোনওই কাজে লাগল না? যাই করি না কেন তৃতীয় আর একজনের সাহায্য নিতে হবে। জানাজানি হয়ে যাবে। আমার যা অবস্থা তাতে তো বাড়ির লোককেও জানানো যাবে না।

আমার এক উকিল বন্ধুকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা ধর, হঠাৎ যদি কেউ কয়েক কোটি টাকা পেয়ে যায়, তার কি হবে?

সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে ধরবে।

কেন? কোন অপরাধে?

জানতে চাইবে সোর্সটা কি? তারপর পেছনে লেগে যাবে ইনকামট্যাকসের লোক। হাতে হ্যারিকেন ধরিয়ে দেবে।

অ, বলে আমি একটা ঢোঁক গিললুম।

বন্ধু বললে, কত রকমের অদ্ভুত চিন্তাই না মানুষের আসে!

আমি মনে মনে হাসলুম। ভাবছে গল্প কথা। আমি যদি থলিটা উল্টে, হীরে আর চুনীগুলো সামনে ছড়িয়ে দি, যতই আমার প্রাণের বন্ধু হোক বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে। আর কোনও কথা না বলে আমি চলে এলুম।

সেদিন রাতের বেলা ঠিক করে ফেললুম আমার ওই থলিটা ব্যাঙ্কের লকারে ফেলে রাখবো। সুইস ব্যাঙ্কে, সুইস ব্যাঙ্ক শুনেছি; কিন্তু তার নিয়মকানুন আমি জানি না। সুইস ব্যাঙ্কে টাকা আছে এমন কোনও বড়লোককেও আমি চিনি না। পরের দিন লকারের ঠাণ্ডা গহ্বরে লাল ভেলভেটের থলিটা ফেলে দিলুম! যাও, তোমার কোনও দাম নেই। হীরে আর পাথর কুচিতে কোনও তফাৎ নেই আমার কাছে।

আমার সেই রেজিগনেশান লেটার বুকপকেটেই রয়ে গেল। রইল তোমার চাকরি বলে ফিরে আসতে পারলুম না ঘরের ছেলে ঘরে। ভেবেছিলুম কোটিপতি হলেও বাইরের কাউকে বুঝতে দেবো না। জীবনযাত্রার মান আরও নামিয়ে আনবো। পাড়ার লোক, বাড়ির লোক হঠাৎ একদিন দেখবে বিশাল একটা লরি ঢুকছে গলিতে। কয়লার লরি। লরিটা আমার বাড়ির সামনে থামবে। আমার বউ ছুটে এসে বলবে, একি! তোমাকে আমি দোকানে দু'মন কয়লা দেবার কথা বলতে বল্লুম, এ যে দেখছি ঢাউস একটা লরি পাঠিয়ে দিলে!

আমি হেসে বলবো, দোকান নয় এ কয়লা আসছে ডিপো থেকে। তোমাকে বলা হয়নি, আমি কাল থেকে একটা কয়লার দোকান দিচ্ছি। এরপর আসবে চ্যালা কাঠ।

বউ বলবে, সত্যিই তোমার মাথাটা গেছে? অমন ভালো চাকরিটা ছেড়ে শেষে কাঠ আর কয়লার দোকান। বাড়ির সামনের পাঁচিলটা ভেঙ্গে ফেলেছি। সেখানে একটা আটচালা? বিশাল এক দাঁড়িপাল্লা হেলে আছে একদিকে। বড় বড় বাটখারা। কয়লার ডাঁই, দুটো রেলগাড়ি। কেলে কেলে বস্তা। ফেত্তা মেরে ধুতি পরেছি। ফুটোফাটা গেঞ্জি। পইতেতে দুলছে ক্যাশ বাকসের চাবি।

কল্পনা কল্পনাই রয়ে গেল। রোজ সকালে উঠি, ধড়ফড় করে অফিসে ছুটি। সন্ধের পর ফিরি আর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে ভাবি, ইচ্ছে করলে,

আমি একটা প্যালেস তৈরি করতে পারতুম। দু একর বাগান। গ্যারেজে দশটা দশ রঙের গাড়ি। পারি কিন্তু পারবো না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি, তালে-গোলে হাজার ছয়েক টাকা বেরিয়ে গেল। কাজের কাজ কিছু হল না। সেই পোস্তর তরকারি আর ভাত। সেই মাঝ মাসে টাকার টানাটানি। এর ওর কাছে হাত পাতা।

একদিন রাতে বউকে বলছি, জানো তুমি কত বড়লোক! তুমি প্রায় বারো কোটি টাকার মালিক। বউ বললে, যত বয়েস বাড়ছে তত তোমার বাজে বকাও বাড়ছে।

আমি বললুম, তুমি বিশ্বাস করো, আমি মিথ্যে বলছি না, তুমি দশ বারো কোটি টাকার মালিক। জানো তো একশো লাখে এক কোটি টাকা।

আমার কথা শুনে আমার বউয়ের চোখ জলে ভরে গেল।

আমি বললুম, তুমি কাঁদছো কেন?

সে বললে, ওগো তুমি পাগল হয়ে যেও না। তুমি যেমন আছ সেইরকম থাকো। তা না হলে আমি যে বড় একা হয়ে যাবো কাকে নিয়ে বাঁচবো?

আমি বললুম, বিশ্বাস করো, এতদিন তোমাকে বলিনি আজ তোমাকে বলছি, আমার কাছে কুড়িটা নকুলদানা সাইজের সাচ্চা হীরে আর একশো কুড়িটার মতো বেদানার দানা সাইজের চুনী আছে। সব আছে আমার ব্যাঙ্কের লকারে।

কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, বুকের বাঁ দিকটা তুড়ুক তুড়ুক করে তিনবার নেচে উঠল। মনে হল হার্টে যেন কেউ পিন ফোটাচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে গেল। আর মুখ দিয়ে একটা কথাও বের করতে পারলুম না। হঠাৎ দেখি খুব হাল্কা হয়ে গেছি। তুলোর মতো মেঘের মতো। আরো আশ্চর্য, আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি। সামনে আয়না নেই কিন্তু আমার প্রতিফলন দেখছি। আমার বউয়ের কাঁধের ওপর আমার মাথাটা হেলে পড়েছে। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। মসীবর্ণ চেহারা। মনে মনে বললুম, যাঃ ব্যাটা শেষ হয়ে গেল নাকি!

আর ঠিক সেই সময় আমার কাঁধে যেন কে হাত রাখল। সারা মন যেন জুড়িয়ে গেল। কানের কাছে গাছের পাতায় বাতাসের সুরের মতো গলায় কে যেন বললে, যাক এবারের মতো খেলা সাঙ্গ, যা দেহটাকে একটা লাথি মেরে আয়।

কে আপনি?

আমি ভগবান।

প্রভু আমি কি মরে গেলুম?

হ্যাঁ বাবা। মরে গেলে না, দেহটা পাল্টালে এই আর কি! যা ওই খাঁচাটাকে

লাথি মেরে আয়। আমি আমাকে লাথি মারবো।

আর তো আমি তুমি নেই, যতক্ষণ, যতদিন দেহে ছিলে ততদিন আমি তুমি। যাও, ক্যাঁত করে ওই মায়ার শরীরটাকে একটা লাথি মেরে এসো।

সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরকে লাথি মারতেই সেটা হেলে পড়ল ওই রমনীর কোলে। মহিলা তখন আকুল হয়ে প্রশ্ন করছে হ্যাঁ গা, কোন ব্যাঙ্কে আছে তোমার হীরে, চুনী, পান্না। হ্যাঁ গা কোন ব্যাঙ্কের লকারে আছে তোমার হীরে, চুনী, পান্না!

ভগবান আবার আমার কাঁধে বন্ধুর মতো, পিতার মতো হাত রাখলেন। বললেন, চলে আয়।

আমরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে, বেড়াতে বেড়াতে চলেছি। মাঠ, ঘাট, গাছ-পালা, নদী প্রান্তর সব অন্যরকম। আরও উজ্জ্বল, আরও নির্মল। ভগবান বললেন, অবাক হচ্ছ। অবাক হবার কিছু নেই। এ সবই হল আসল। নিচে যা দেখে এসেছ, সে সব নকল। আসলের ছায়া।

আমি তখন বললুম, আপনি আমাকে যাকে বলে ছপ্পর ফুঁড়ে দিলেন, কিন্তু কাজে লাগল না। সব পড়ে রইল ওখানে।

তুই তো আমার বার্তাটাই ধরতে পারিস নি। চলে গেলি টাকা পয়সার জগতে। ভেবেছিলাম, কথামালার সেই গল্পটা তোর মনে পড়বে।

কোন গল্পটা প্রভু!

সেই যে রে, একদা এক কাক গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে বড় তৃষ্ণার্ত হল। জল চাই একটু জল। তা আমি তাকে একটা কলসী দিলুম আর দিলুম কিছু নুড়ি পাথর। আর একটু দুষ্টুমিও করলুম। জানিস তো ভগবান একটু রসিক। সৃষ্টিকে নিয়ে মাঝে মধ্যে মজা করাই তার কাজ। কাককে আমি ভরা কলসী দিলুম না। তলায় সামান্য কিছুটা জল ভরে ছেড়ে দিলুম। শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করলেই হবে, পুরুষকার থাকবে না। কাকের কিন্তু সেই গুণটি ছিল। সে ঠোঁটে করে এক একটি নুড়ি তোলে আর কলসীর মধ্যে ফেলতে থাকে। আর ধীরে ধীরে জল উঠে আসে কানায়।

প্রভু সে গল্প আমি পড়েছি; কিন্তু আমিও তো কম করিনি।

তুই ওটাকে টাকা করতে চেয়েছিস। পৃথিবীর সব মানুষের যা ধান্দা। আমি চেয়েছিলুম কর্ম। জীবনের সৎকর্ম হল এক একটি হীরকখণ্ড। জীবন যখন খালি হয়ে আসতে থাকে, জীবন পাত্রে প্রাণরস যখন এতটুকু তলানি মাত্র, তখন এক একটি সৎকর্মের হীরকখণ্ড ফেলতে থাকো আর চুনীর লাল রঙ হল

অনুরাগ, ভালোবাসা। জীবনের সৎকর্মে অনুরাগের লাল রঙ ধরাও। সেই বার্তাটাই তুই ধরতে পারিসনি বোকা। তুই ছুটলি কতকগুলো ছাপা, ময়লা কাগজের সন্ধানে।

তাহলে আমি আর একবার ফিরে যাই। দেহটা এখনও আছে।

নিজের ইচ্ছেয়। নিজের ইচ্ছেতে জন্মানোও যায় না, মরাও যায় না। আয় তোকে সৃষ্টিচক্রের একটা খোপে ভরে দি। সময় হলেই আবার শূন্য থেকে শুরু করে শূন্যে ফিরে আসবি।

pathagar.net

প্রেমের মদ বিয়ের ভিনিগার

পৃথিবীতে একজন প্রেমিক ছিলেন, তিনি সাজাহান। যুদ্ধটুদ্ধ তেমন করলেন না। দিগ্বিজয়ের ধার ধারলেন না। সাঙ্ঘাতিক একটা তাজমহল তৈরী করে জেলখানায় পচে মরলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের কলম থেকে অসাধারণ একটি কবিতা আদায় করে নিলেন। বাঙলার দুই বিখ্যাত নাট্যকার দুখানা নাটক লিখে ফেললেন। আর এই সেদিন পর্যন্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ও ঠাকুরদাস মিত্র কলকাতার রঙ্গমঞ্চে রাতের পর রাত হাহাকার করে গেলেন।

আর একজন রাজাও অবশ্য ইতিহাস করে গেছেন। ইংলাণ্ডের অষ্টম এডওয়ার্ড। ১৯৩৬ সালে সিংহাসন ছেড়ে দিলেন। আমেরিকান মহিলা ওয়ালিস সিম্পসনকে বিয়ে করবেন বলে। সিম্পসন এর আগে দু'বার বিবাহ করেছিলেন। অবশ্যই প্রেম করে। সে প্রেম টেঁকেনি। সিংহাসনত্যাগী রাজার গলায় মালা দিয়ে এই মধ্যবয়সী মহিলা অবশেষে শান্ত হলেন।

ইতিহাসে আর এক ডিউকের উল্লেখ পাওয়া যায়, নরম্যাণ্ডির ডিউক রবার্ট। এক দিন দিবা দ্বিপ্রহরে ডিউক ঘোড়ায় চেপে তাঁর রাজধানী ফ্যালেইসের দিকে চলেছেন। পথের পাশে এক স্রোতের ধারে একটি মেয়ে কাপড় কাচছে। মেয়েটি এক চর্মকারের কন্যা, নাম আরলেট। ডিউক প্রেমে পড়ে গেলেন।

আরলেটকে সেই অবস্থাতেই ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলে গেলেন নিজের দুর্গে। ডিউকের স্ত্রী ছিলেন। সুন্দরী। বড় বংশের মেয়ে। হলে কি হবে। বাঙলায় প্রবাদ আছে, যাকে দেখে মজে মন কি বা হাড়ি, কি বা ডোম। শচীনদেব বর্মনের সেই গান—"প্রেম-যমুনায় হয়তো বা কেউ ঢেউ দিল, ঢেউ দিল রে আকুল হিয়ার দুকুল বুঝি ভাঙলো রে!' ডিউক আরলেটের প্রেমে হাবুডুবু। জন্মালেন উইলিয়াম। বিখ্যাত বীর, উইলিয়াম দি কনকারার। পৃথিবী প্রেমের জয়গান গাইলেও জারজ-সন্তানকে আজও গ্রহণ করতে শিখল না। বাস্টার্ড বলে নাক বাঁকায়। ঘৃণার উইলিয়াম অনেক ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে বড় হয়ে, আলেঁসঁ নগর অবরোধ করলেন, তখন কারাবাসীরা তাঁর শক্তি বুঝতে না পেরে ব্যাঙ্গ করে দেয়ালে দেয়ালে চামড়া ঝুলিয়ে দিয়ে চিৎকার শুরু করল, 'চর্মকারের জন্যে চামড়া'। উইলিয়াম এই ব্যাঙ্গের জবাব দিলেন তরোয়ালের মুখে। সারা শহরের মানুষকে কচুকাটা করে ছেড়ে দিলেন।

আমাদের রামী চণ্ডীদাসের কাহিনী অনেকটা এইরকম। ব্রাত্য প্রেমের কাহিনী। চণ্ডীদাস কবি ছিলেন তাই বাঁচোয়া। শুধু গান আর চাঁদের আলোর ইতিহাস। রাজা মহারাজা হলে কি হত জানি না। প্রেম আর প্রেমের ফল দু রাস্তায় চলে।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং যখন পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন, তখন বড় লোক ছাড়া কারুর সাধ্য ছিল না হাত বাড়াবার। এখন পেনিসিলিন ঘরে ঘরে। সেই রকম প্রেম যখন মার্কেটে প্রথম বেরলো তখন সকলে প্রেম-সায়রে ঝাঁপ দিতে পারেনি। অনেক বাধা ছিল। সমাজের চোখ রাঙানি ছিল। কেউ প্রেম করেছে শুনলে লোকে এমন ভাব করত যেন তার মায়ের দয়া হয়েছে। পাড়ায় গেজেট বসে যেত। আমার ছেলেবেলায় পাড়ায় এক দাদা, পাড়ারই এক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিলেন। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার পর পাড়ার মাতব্বররা এক রবিবারের সকালে সেই দাদাকে ধরে প্রথমে মাথার আধখানা চুল কামিয়ে দিলেন। তারপর গালে চুনকালি মাখিয়ে, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরালেন। আর মেয়ের বাবা তিন দিনের মধ্যে দোজপক্ষের একপাত্র জুটিয়ে মেয়েকে প্রায় জলে ফেলে দিলেন।

সে যুগ আর নেই। যুগ অনেক এগিয়ে গেছে। যুবক যুবতীরা এখন নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই তৈরী করছেন। প্রেম এখন জেনারেল নলেজের মতো। না কারাটাই গাঁইয়ার লক্ষণ। উত্তর কলকাতার একটা পার্ক আছে। বিখ্যাত এক মানুষের নামে। সেই পার্কের চলতি নাম বৃন্দাবন পার্ক। লাভার্স লেন।

গাঁজাপার্কের মতো। সেখানে গাছের তলায় তলায় হৃদয়ের লেনদেন হয়। সিসটেমটাও খুব সুন্দর। অনেকটা রেস্তোরাঁর মতো। চট করে ঢোকা যায় না। কিউ দিতে হয়। কর্মকর্তারা বলবেন, যাও ছ'নম্বর টেবিল খালি হওয়ার মতো, ছ'নম্বর গাছতলা খালি হয়েছে। অদৃশ্য মিটার আছে। ঘণ্টা হিসেবে চার্জ। এই গাছতলার কটা প্রেম পেকে সংসারের চাতালে ফেটে পড়ে, সে হিসেব নেই।

কলকাতার খুব কাছে গ্রাম গ্রাম একটা জায়গায় খোলা একটা মাঠের পাশ দিয়ে লম্বা একটা রাস্তা চলে গেছে। সেই রাস্তায় প্রতিদিন সন্ধ্যের সময় ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে কারফিউ জারি হয়। পাড়ার ছেলেরাই জারি করে। সাইরেন বাজার মতো তিনবার হুইশিল বাজে। দুম্ করে একটা পটকা ফাটে। ল্যাম্পপোস্টে দু-একটা যা আলো জ্বলে পটাপট নিবে যায়। এই দু'ঘণ্টার জন্যে পাড়ার কারুর বাড়ির বাইরে পা দেবার নিয়ম নেই। পান বিড়ির দোকানে এক ভদ্রলোক দেশলাই কিনতে এসে ঘড়ি দেখছেন আর তাড়া দিচ্ছেন, 'জলদি ভাই জলদি। এখুনি কারফিউ হয়ে যাবে।'

ভদ্রলোকের বাড়ি ওই রাস্তায়। দু'ঘণ্টা পরে আবার 'অল ক্লিয়ারের' বাঁশি না বাজলে ওই পথে হাঁটা যাবে না। বা গেলেও এমন সব দৃশ্য চোখে পড়বে যা বয়স্ক মানুষের পক্ষে গুরুপাক। ত্রৈলোক্যবাবু অনেক আগে লিখেছিলেন, সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে এক একটা মশার আকার আকৃতি প্রায় চড়াইপাখির মতো। বাদা অঞ্চলের সমস্ত মানুষকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, ভাই ও আমার লোক, ওর রক্ত আমিই শুষবো। তোমার লোক হল ওই দ্বিতীয়টা। সেই রকম পাড়ার ছেলেরাও প্রেমিক হিসেবে মার্কা হয়ে যায়। ও চণ্ডলার, সে শ্যামলীর, তুমি মানসীর। স্বামীজী বলেছিলেন, বলো, জন্ম হইতেই আমরা মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত। সেই বলি কি এই বলি! হায় উল্টো বুঝলি রাম। মেয়ে স্কুলের ছুটির পর রাস্তায় সাইকেলের সংখ্যা বেড়ে যায়। ওপাশ থেকে, এপাশ থেকে, সেপাশ থেকে ছুঁচো বাজির মতো সাইকেলের সে কি র‍্যালা। মেয়েদের সে কি হাসি! উল্টে উল্টে পড়ছে। সাইকেলারোহী ডনজুয়ানদের পোশাকও একেবারে বাঁধা ধরা। প্রেমের জার্সি। গাঢ় রঙের চোঙা প্যাণ্ট, হালকা রঙের বুক খোলা পাঞ্জাবি। যদি প্রশ্ন করা হয়, 'আপনার ছেলেটি কি করে মশাই?' উত্তর হবে, 'প্রেম করে।' এই 'এলডোরাডো' তে ছেলেদের আর কি করার আছে, প্রেম ছাড়া! শ্রীচৈতন্য থেকে স্বামীজী সকলেই বলে গেছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। সে প্রেম, কি প্রেম, কেমন প্রেম অত বিচারে কি প্রয়োজন! আর প্রেম হল লেগে

থাকার ব্যাপার, ভেরি এনগেজিং সাবজেক্ট। এক ধরনের সাধনা। ধৈর্য বাড়ায়। পাশ থেকে এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার বাক্যালাপ শুনলে বোঝা যায়, অমন বোকা বোকা কথা স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ বলতেও পারে না, সহ্যও করতে পারে না। আসল কথা তো একটাই। কথামালায় সেই একটা কথা হারিয়ে বসে আছে।

এই ধরনের কথোপকথন দু-একবার শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মধুর অভিজ্ঞতা ঃ প্রেমিকা ঃ [দাঁতে ঘাস কাটতে কাটতে] জানো, মেজ বউদি না সন্দেহ করেছে।

প্রেমিক ঃ [প্রেমিকার হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে] কি করে বুঝলে ?

প্রেমিকা ঃ আমি যখন তোমার কাছে আসবো বলে বেরোচ্ছি না, তখন বলছে, কি ঠাকুরঝি খুব উড়ছ, তাই না ! তাও তো আমি কিছুই সাজিনি।

প্রেমিক ঃ তোমাকে না সাজলেই ভালো দেখায়। কি সুন্দর !

প্রেমিকা ঃ যাও, সুন্দর না ছাই। আমি বলে দিন দিন মুটিয়ে যাচ্ছি। আমার চেয়ে কত সুন্দরী তুমি পাবে !

প্রেমিক ঃ আমার জন্যে তুমি এক পিসই তৈরি হয়েছ। জানো তো শ্যামল বলছিল, বিশু তুই আজকাল কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিস।

প্রেমিকা ঃ কোন শ্যামল ? ওই হ্যাংলা মতো ছেলেটা ! ব্যাড়ব্যাড় করে বকে !

প্রেমিক ঃ ধুস, ও তো জগা ! শ্যামলকে তুমি দেখনি। দেখলে মাথা ঘুরে যাবে।

প্রেমিক ঃ আমার মাথা ঘুরে গিয়ে দরকার নেই। আমার এই একটা ভুতেই জীবন আলো।

প্রেমিক ঃ এই সত্যিই তুমি আমাকে ভালোবাসো ?

প্রেমিকা ঃ [বুকে মাথা রেখে] কি তোমার মনে হয় ! তুমি আমার একমাত্র হনুমান ! এই শ্যামলের কেউ নেই ?

প্রেমিক ঃ কেন থাকবে না ! সবাই আছে। বাবা, মা, ভাই বোন।

প্রেমিকা ঃ দুর গাধা, আমার মতো কেউ নেই !

প্রেমিক ঃ তুমি যখন আমাকে গাধা, হনুমান বলো না ! কি মিষ্টি শোনায় ! কি মিষ্টি, কি মিষ্টি ! শ্যামল প্রেমটেম বোঝে না। ব্যাটা মহা সেকেলে। আর সময় কোথায় ! সি এ করেছে। পাশ করেই বাবার ফার্মে বসে যাবে।

প্রেমিকা ঃ আর তুমি কি করছো ?

প্রেমিক ঃ আমি তুমি করছি।

প্রেমিকা ঃ আমাকে একেবারে উদ্ধার করে দিচ্ছ। কবে বিয়ে করবে ?

প্রেমিক ঃ মাড়োয়ারীদের মতো কথা বলো না তো! ভাও কেতনা, ভাও কেতনা!

প্রেমিকা ঃ একটা কিছু করবে তো! দুম্ করে বাড়ি থেকে বিয়ে দিয়ে দিলে তখন কি করবে ?

প্রেমিক ঃ আত্মহত্যা! বিষ খাবো বিষ।

প্রেমিকা ঃ এই সত্যি তুমি আত্মহত্যা করবে! বলো না গো!

প্রেমিক ঃ তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি।

প্রেমিকা ঃ কেবল পারো না একটা চাকরি জোটাতে! শ্যামলের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে ?

প্রেমিক ঃ কেন ঝুলে পড়বে ?

প্রেমিকা ঃ দেখ, মনটাকে ছোট কোরো না। ঝুলে পড়ার হলে, আমার দাদার বন্ধুর গলায় কোন কালে ঝুলে পড়তুম। জানো, তার একটা লাল মারুতি গাড়ি আছে।

প্রেমিক ঃ ও, তাই আমাকে তিন দিন দাঁড় করিয়ে রেখে এলে না।

প্রেমিকা ঃ বললুম না, আমার জ্বর হয়েছিল। বিশ্বাস হল না!

প্রেমিক ঃ আগে হয়েছিল। এখন আর হচ্ছে না।

প্রেমিকা ঃ আমার গলার কাছে হাত দিয়ে দ্যাখো, এখনও একটু একটু জ্বর আছে। মাইরি বলছি, অন গড।

ছেলেটি এরপর এমন ভাবে মেয়েটির জ্বর পরীক্ষা করতে লাগল, ইডেনে রাত নেমে এলেও আর বসা গেল না।

এই হল প্রেমের প্রথম পর্ব। যে সব প্রেম প্রথম পর্ব পেরিয়ে দ্বিতীয় পর্বের দিকে গড়ায়, তার তৃতীয় পর্বটা খুব একটা সুখের হয় না। যেমন, একটি সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে লম্বা চওড়া একটি ছেলের প্রেমে পড়ে গেল। ছেলেটি অশিক্ষিত। সামান্য একটা চাকরি করত। আর মাঝে মাঝে খুব রঙচঙে পোশাক পরে পাড়ার ক্লাবে বিগড্রাম বাজাতো। তখন তাকে রূপকথার নায়কের মতো দেখাত। সেই ড্রামারের দুর্বার আকর্ষণে মেয়েটি একদিন শিক্ষা, সংস্কৃতি, বংশ মর্যাদার পাঁচিল টপকে ছেলেটির গলায় মালা পরিয়ে দিল! একে বলে প্রেমের ম্যালেরিয়া। হিস্টিরিয়াও বলা চলে। কেঁপে এল। অনেকটা তড়কার মতো।

হুঁহুঁ করে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি। তারপর দ্বিতীয় পর্বে কি হবে? অনেকটা লটারির মতো। ছেলেবেলায় আমি একটা খেলা বড়দের খেলতে দেখেছিলাম, কোথায় ঠিক মনে নেই। যতদূর মনে হয় মধুপুরে। দেওয়ালের গায়ে একটা গোঁজ পোঁতা, দূরে থেকে একটা টুপি ছুঁড়ে সেই গোঁজে আটকে দিতে হবে।

খেলাটার নাম ছিল, 'টু পেগ এ হ্যাট'। প্রেমের বিয়ে হল ওই টুপি ছোঁড়ার খেলা। সংসারের গোঁজে আটকালো তো আটকালো, নয়তো পড়ে গেল মাটিতে। 'টু মিস দি পেগ।' আমার এই গল্পের মেয়েটির প্রেমের টুপি গোঁজভ্রষ্ট হল। নিজের পরিবার পরিজনেরা বাড়ি ঢোকা বন্ধ করে দিলে। অবশ্য কারণও ছিল। ভাইয়েরা এই মওকায় বাপের সম্পত্তির পুরোটাই হাতিয়ে নিলে। দেখে শুনে বোনের বিয়ে দিতে হলে, পঞ্চাশ, ষাট ব্যাঙ্ক ব্যালেনস থেকে ঝরে যেত। ব্যাণ্ড-মাস্টারের সঙ্গে বেরিয়ে ভালই হয়েছে। ওদিকে ব্যাণ্ডমাস্টারকে মেয়েটির যদিও বা প্রেমের পেণ্ট মেরে সহ্য হল, অসহ্য হয়ে উঠল তার ঘর-সংসার, অসহনীয় মনে হল তার আনকালচারড বাবা মাকে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই প্রেমের রঙ ফিকে হয়ে গেল। সংসারের কুইনিন বটিকায় প্রেমের ম্যালেরিয়া ঘাম দিয়ে ছেড়ে গেল। ব্যাণ্ডমাস্টার শেষে ব্যাণ্ডের বদলে বউকে ধরে পেটাতে আরম্ভ করল। মাঝে মধ্যে থানাপুলিসও হতে লাগল। শেষে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল প্রতিবেশীর সমস্যা।

সব ক্ষেত্রেই যে এতটা আশাভঙ্গের কারণ হবে তা নয়। অসম জুটির এমন সমস্যা হতেই পারে। তবে সমাজের ওপরতলায় ঘটনা খুব একটা সুখের হয় না। এসব নিয়ে আমরা তেমন মাথা ঘামাই না। সমীক্ষা-টমীক্ষাও হয় না। কে কাকে বিয়ে করল, কেমন করে করল, কেন ফাটল ধরল, ব্যক্তিগত, পরিবারগত ব্যাপার। আমরা বুঝি প্যাঁপোর প্যাপোর, নিমন্ত্রণ, খাওয়াদাওয়া, এক সপ্তাহ হল্লাগুল্লা। তারপর যার ম্যাও সে সামলাক। তবে কাগজের কল্যাণে নানা খবর তো উড়ে আসে। যেমন শিল্পীদের প্রেমজ বিয়ে না এদেশে, না বিদেশে ধোপে টেঁকে না। উদাহরণ, এলিজাবেথ টেলার কতবার যে বিয়ে করেছেন নিজেরই মনে নেই। রিটা হেওয়ার্থ মোট পাঁচবার বিয়ে করেছিলেন। পঞ্চ স্বামীর একজন ছিলেন, প্রিনস্ আলিখান। এর আগে বিয়ে করেছিলেন অরসন ওয়েলসকে। অবশেষে যা হয়। বোতল, বার্ধক্য, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃত্যু।

বিদেশের কথা থাক। জন্মালে যেমন মরতে হয়, ওদেশে বিয়ে করলেই তেমনি ডিভোর্স করতে হয়। আমাদের দেশেও সেই হাওয়া বইছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই নামকরা হলে, ব্যক্তিত্বের ঠোকাঠুকি। যাঁরা নামকরা নন অথচ ওপরতলা,

কি মধ্যতলার চরিত্র, তাঁরাও প্রেমের পিরিয়াডে এক রকম, বিয়ের পরে আর একরকম।

কারণ খুব সাধারণ। যখন প্রেম চলেছে তখন সবাই সুন্দর। মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধব। লাভ ইজ ব্লাইন্ড। প্রেমে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, এ.কথা আমরা শুনেছি। স্যামুয়েল জনসন ভারি সুন্দর বলেছিলেন, Love is the wisdom of the fool and the folly of the wise, বাঙলা করব না, করলে মজাটা নষ্ট হয়ে যাবে। দাঁত একটু উঁচু, চোখ সামান্য টেরা, গাল ঈষৎ ভাঙা, প্রগলভ, দামড়ার মতো চালচলন, নাক থ্যাবড়া। প্রেমের সময় এসব চোখে পড়ে না। বিয়ের পর, পার্ক থেকে খাটে উঠলে অস্ফুট 'বলহরি' শোনা যায়। যতক্ষণ প্রেম ততক্ষণ ব্যাপারটা ফুরফুরে। তুমি আমার আমি তোমার। বিয়ের পর নানা সম্পর্কের ভিড় চারপাশে। নানা জনের নানা চাহিদা। কর্তব্যের মালা গাঁথা। তখন গাছতলায় পাশাপাশি বসে বাদাম-ভাঙা গল্প নয়, ভূমিকা-পালন। প্রেমের এই দ্বিতীয় পর্বে চতুর্দিকে কষ্টিপাথর ছড়ানো। অনবরত ঘষামাজা। সমস্যাটা মেয়েদেরই বেশি। মেয়েদেরই নিজের ঘর ছেড়ে অন্যের ঘরে আসতে হয়। খাপ খাইয়ে নেবার কথাটা তাদের দিকেই ওঠে। তারাই হোঁচট খায় বেশি। ছেলেদের মানসিকতা বড় চটুল। অজানাকে জানা হয়ে গেলে তারা আবার বিজয় অভিযানে বেরোতে চায়। প্রেমে দুজনের সম্পর্ক থাকে সমান সমান। প্রায়শই ছেলেরা তখন অতিমাত্রায় নরম থাকে। অনেক সময় ভিখিরির মত নতজানু। নিজের আসল চেহারাটা রেখে ঢেকে এগিয়ে আসে প্রার্থীর মতো। গানেই তো আছে, 'ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে তোমারে করেছে রানী।' ছাঁদনাতলা থেকে বউ হয়ে প্রেমিকা যেই ছেঁচতলায় এলো প্রেমিক স্বামী তখন প্রভু। সংস্কার যাবে কোথায়? মেয়েদের ক্ষেত্রে সেইটা একটা বড় রকমের আঘাত। আগে তার পায়ে যে মাথা ঘষতো এখন তার পায়ে মাথা ঘষতে হবে। সম্পর্কের এই রূপান্তর ভূমিকম্পের মতো। কল্পনার প্রাসাদ ভেঙে চুরে চুরমার। সমারসেট মম 'দি সার্কিং আপ'-এ সুন্দর একটি কথা বলেছেন, It takes two to make a love affair and a man's meat is too often a woman's poison.

এখন প্রশ্ন হল প্রেমই বা কি? বিরাহই বা কি! নিঃস্বার্থ প্রেম বলে কিছু আছে কি? বিখ্যাত রসিক জেরোম 'দি আইডল থটস অফ এন আই ডল ফেলো'তে লিখছেন, প্রেম হল হামের মতো। প্রত্যেকেরই একবার করে হবে। আর হামের মজা হল, একবার হলে আর দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হবার আশঙ্কা নেই।

আর 'ট্রুলাভ' প্রকৃত প্রেম সম্পর্কে ১৬৬৫ সালে লা রকিফাউলকড যা বলে গেছেন তার আর জুড়ি নেই, True love is like ghosts, which everybody talks about and few have seen. প্রকৃত প্রেম হল ভূতের মতো। সবাই বলে, কিন্তু দেখেনি টেক।

জ্ঞানী মানুষের উপদেশ, যাকে প্রেম করবে তাকে বিয়ে করবে না। স্বার্থের সংসারে প্রেম পুড়ে যায়। যে প্রেম বিয়ের পরেও বেঁচে থাকবে সে প্রেম আমরা শিখিনি। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ এরিখ ফ্রম, 'দি আর্ট অব লিভিং'-এ যা শেখাতে চেয়েছেন তা আমাদের দ্বারা জীবনেও হবে না। তিনি বলছেন, Immature love says : 'I love you because I need you'. Mature love says : 'I need you because I love you'.

কাঁচা প্রেম বলবে ঃ 'আমি তোমাকে ভালবাসি কারণ আমি তোমাকে চাই।' পাকা প্রেম বলবে, 'আমি তোমাকে চাই কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।'

একটা গল্প মনে পড়ছে। অ্যারিস্টটলের এক ছাত্র প্রেমে একেবারে হাবুডুবু। ছুটে এল গুরুর পরামর্শ নেবার জন্যে, বিয়ে করবে কি করবে না! অ্যারিস্টটল বললেন, 'শোনো ছোকরা, যদি মনে হয় বিয়ে না করলেই নয়, তাহলে করে ফেল। যদি সুখের হয় খুবই ভালো। যদি না হয়, তাহলে দুঃখের কিছুই নেই। তুমি আমার মতো দার্শনিক হবে।'

গাঁক তাঁর 'দি লোয়ার ডেফতস'-এ লিখে গেছেন, 'মেয়েরা যখন বিয়ে করে সেটা কেমন জান? শীতকালে বরফের চাদরের একটা গর্তে লাফ মারার মতো। একবারই করে আর মনে রাখে সারা জীবন।'

তাহলে সেই বিখ্যাত জার্মান প্রবাদটি মনে রাখা ভালো ঃ The bachlor is peacock, the engaged man a lion, and the married man a Jackass. আইবুড়ো হল ময়ূর, প্রেমিক হল সিংহ, বিয়ের পর দামড়াগাধা। চোখ খোলা রেখে বিয়ে করবে আর বিয়ের পর আধবোজা চোখে সারা জীবন কাটাবার চেষ্টা করবে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের এই নির্দেশ কে পালন করবে? ফলে প্রেমের মদ হয়ে দাঁড়াবে বিয়ের ভিনিগার।

Pathagar.Net

পরের কথা নিজের কানে

'বিধুবাবুর বড় মেয়েটিকে কেমন সুন্দর দেখতে হয়েছে দেখেছো। মা দুর্গার মতো টানটানা চোখ। বাঁশির মতো টিকোলো নাক। দুধে-আলতা রঙ। আহা, যেন প্রতিমা।'

'অ, ওই মেয়েটার কথা বলছো। ওই যে মাঝে মাঝে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দেখেছি বটে। তোমার খুব সুন্দর মনে হচ্ছে! চোখ দুটো বড় বড় ঠিকই তবে মা দুর্গার মতো নয়। গরুর চোখও তো বড় বড় হয়, তা বলে গরু কি সুন্দরী! আর বাঁশির মতো নাক বলছো? তুমি বাঁশও দেখনি, বাঁশিও দেখনি। মেয়ে-ছেলের অত উঁচু নাক ভালো নয়!'

'যাই বলো, তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।' 'তা হয়তো যায় না। তবে জেনে রাখো, যা দিনকাল পড়েছে ওই মেয়েকে সামলানো মুশকিল হবে।'

কারুর সুন্দরী মেয়ে থাকলে প্রতিবেশীর ভীষণ দুর্ভাবনা, মেয়ে ঘরে থাকবে কি না! আবার অসুন্দরী মেয়ে থাকলেও জীষণ দুশ্চিন্তা, বিয়ে হবে কি করে। এই দুটো চিন্তারই এক উৎস—কারুর ভালো যেন না হয়! মন্দ হলে, যে সহানুভূতি সেটা আসলে আনন্দেরই একটা দিক। বিপুলবাবুর ছেলে হঠাৎ বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেল সংসার ফেলে। পড়ে রইল বুড়োবুড়ি অবিবাহিতা

বোন। জনে জনে আসে আর খুঁচিয়ে ঘা করে দিয়ে যায়—অ্যাঁ, এর নাম শিক্ষা। লেখাপড়া শিখিয়ে হলটা কি। এর চেয়ে টাকাটা ব্যাঙ্কে ফিক্‌সড করে রাখলে এই বৃদ্ধ বয়সে দেখতো। কি সব্বনেশে কথা গো, তুই একটা শিক্ষিত ছেলে, বড়লোক শ্বশুর দেখে ঢলে পড়লি! বুড়ো-বুড়ির কথা ভাবলি না একবার! এর চেয়ে আমার অশিক্ষিত ছেলেই ভালো ছিল।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, রেলিশ করা। খাওয়া এক জিনিস আর তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা আর এক জিনিস। পরচর্চা আর পরনিন্দার মতো রেলিশিং আর কিছু নেই। অনেকটা চেটে চেটে চাটনি খাওয়ার মতো। কোনও মানুষ যদি বিনয়ী হয় লোকে বলবে ন্যাকামি। উল্টোটা হলে বলবে, অহংকারে একেবারে মটমট করছে।

আমি একজনকে চিনতাম, তিনি মহিলা। খুব অসুস্থ। প্রায় ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা। তাঁর কানের কাছে যদি বলা যেত— বকুলদি সিনেমার টিকিট কেটে এনেছি। তিনি ককাতে ককাতে বলতেন— এনেছিস! ওরে বাবারে মরে যাব রে! বলতে বলতে উঠে বসলেন ; তারপর খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন— চল তা হলে।

আমি পাশাপাশি আর একটা ব্যাপারও দেখেছি—কর্তা খুব অসুস্থ। বিছানায় ফ্ল্যাট। চোখ বুঁজিয়ে পড়ে আছেন। ঘরভর্তি আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব। নানা কথা। কে একজন বললে—সন্তোষের বড় ছেলেটা একেবারে বখে গেল। ফিনিশ। কর্তা চোখ না খুলে বললেন—যেমন বাপ, তার তেমনি ছেলেই হবে তো।

কর্তার মাথার কাছে বসেছিলেন তাঁর বিমর্ষ স্ত্রী। মাঝে মাঝে কপালে হাত বুলোচ্ছিলেন। একটু আগে স্বামীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন। হার্ট বড় হয়ে গেছে। রক্তে চিনি। লিভারে ঝামেলা। তিনি বললেন, শুধু বাপ কেন, মাটিও তো সুবিধের নয়। তিন ছেলের মায়ের সাজপোশাক দেখেছ। সঙ্গে সঙ্গে কর্তা কথাটা লুফে নিলেন। চোখ খুলে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বললেন—কোন ঘরের মেয়ে দেখতে হবে তো। বাপ তো নর্দমায় গড়াগড়ি যেত। তিনটে মেয়ে তিন দিকে ছটকে গেল। সব কটাই ছেলেধরা।

একজন শ্রোতা প্রতিবাদ করলেন—কথাটা ঠিক নয়। ওর শ্বশুর খুব ধার্মিক ছিলেন। আমি দেখেছি। কর্তা সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় আড়কাত হলেন। হৃদয়ের ধুকপুকি সেরে গেল। চিনিজনিত মাথা ঝিমঝিম কমে গেল। বালিশ থেকে মাথা তুলে বললেন—কে বলেছে ধার্মিক ছিলেন। বকধার্মিক। ভেকধারী

শয়তান। আমার কাছে খাপ খুলতে এসো না। আমি নাড়ীনক্ষত্র সব জানি। রেস খেলে খেলে সংসারটাকে পথে বসিয়েছিল। অমন ধার্মিকেই আমাদের ধর্মটাকে খেলে।

আর একজন বললেন—ছোট মেয়েটা তো তিরিশেই তিনটে স্বামী পাল্টালে।

গিন্নি ফাইন্যাল জাজমেণ্ট দিলেন—অমন মেয়ের মুখে ঝাড়ু।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক মহিলা বললেন—অমন মেয়ে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে মুখে নুন দিয়ে গলা টিপে মেরে ফেলা উচিত।

একজন সংশয় প্রকাশ করলেন—জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কি বোঝা যায় বড় হয়ে কে কেমন হবে!

কর্তা এবার সটান উঠে বসলেন—বুঝলে, ইংরেজিতে বলে এগজাম্পল ইজ বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট। আজকাল সব বাপ হয়। বাপ হবার যোগ্যতা ক'জনের আছে! আমার মেজ ভাইকে আমি তাই বলি, দু'হাতে পয়সা কামাচ্ছিস কামা। ছেলে মেয়ে দুটোকে আদর দিয়ে বাঁদর করিসনি।

গিন্নি বললেন—মেজ ঠাকুরপোকে কিছু বলে লাভ নেই। বউয়ের কথায় ওঠবোস করে। ছেলে তো এই বয়সেই প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট ওড়াচ্ছে। কাঁচা পয়সা হাতে এলে যা হয়।

কর্তা বললেন—মেজটা চিরকালই একটু মেনিমুখো। বউটাকে আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছে। এখন আর নামাতে পারছে না। শেষ জীবনে কষ্ট পাবে।

গিন্নি বললেন—মেয়ে তো এরই মধ্যে প্রেম করতে শুরু করেছে।

পরচর্চা আর পরনিন্দা যেন শক্তিরস সালসা। দুর্বলকে সবল করে। অসুস্থকে সাময়িক সুস্থ করে তোলে। যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা ঈশ্বরকোটির মানব তাঁরা বলেন, অপরের দোষ না দেখে তার গুণটা দেখার চেষ্টা করো, তোমার মঙ্গল হবে। এই প্রসঙ্গে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের একটা বাসনার কথা মনে পড়েছে।

I wish I loved the Human Race
I wish I loved its Silly face
I wish I liked the way it walks
I wish I liked the way it talks
And when I am introduced to one
I wish I thought what Jolly fun!

সমগ্র মানবজাতিকে আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করে। বোকা বোকা মুখ, সেও

আমার ভালবাসার। যে যে পথেই হাঁটুক, আমি যেন ভালবাসতে পারি। যে যেভাবেই কথা বলুক আমি যেন ভালবাসতে পারি। কারুর সঙ্গে পরিচয় হলে আমি যেন বলতে পারি—আহা, কি আনন্দের!

ইচ্ছে তো আমাদেরও করে ; কিন্তু স্বভাব না যায় মলে। আমাদের প্রবাদেই আছে—চালুনি করে ছুঁচের বিচার। কেউ বাড়িতে ঘনঘন খবরা খবর নিতে এলে আমরা ভাবতে বসে যাই—কি ব্যাপার বলো তো, এত ঘনঘন আসার কারণটা কি? সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত, দেখবে নিশ্চয় স্বার্থ আছে। বিনা স্বার্থে আজকাল কেউ আসে! সে-যুগ আর কি আছে। আবার কেউ যদি খোঁজ খবর নিতে না আসে, আমরা বলবো যুগটাই পড়েছে এইরকম—কেউ কারুর খবর রাখে না। যে যার সে তার। আমরা এক অদ্ভুত শাঁখের করাত, যেতেও কাটি আসতেও কাটি। কেউ জোরে কথা বললে, বলবো ব্যাটা যেন ষাঁড়। আস্তে আস্তে মৃদু মোলায়েম কথা বললে, পরে সমালোচনা করবে ব্যাটা মিনমিনে। একই সারিতে সবাই খেতে বসেছে। একজন কিন্তু আর একজনের দিকে ঠিক নজর রেখেছে। সব শেষে উৎসব বাড়ির বাইরে এসে, পান চিবোতে চিবোতে স্ত্রী স্বামীকে বলছেন—নতুন বউকে দেখলে? স্বামী বললেন—ওই এক ঝলক। কত বড় হাঁ দেখলে? যেন বোয়াল মাছে রাজভোগ গিলছে।

স্বামী বলতে পারতেন—তুমিও তো সেই থেকে চ্যাকোর চ্যাকোর পান চিবচ্ছো। এটাও তো অসভ্যতা। আসলে প্রাণের লোককে কিছু বলা যায় না। তার সাতখুন মাপ। আবার যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। আমার ছেলে, আমার বউ খুব ভালো। তোমার ছেলে তোমার বউ পয়মাল।

সন্ধানী দৃষ্টি কত দিকে যে যায়! কি ব্যাপার বলো তো, সুভাষ অফিস যাচ্ছে না! মাসের পর মাস বাড়িতে বসে আছে! পাওনা ছিল। ছুটি নিয়েছে বোধহয়। ছুটি নেবার ছেলে! কোথায় কাজ করে, জানো! মোটোর ভিহিক্‌লসে। ডেলি বাঁ হাতের কামাই হাজার দেড় হাজার। সে তোমার এমনি এমনি ছুটি নিয়ে বসে থাকার ছেলে! বসিয়ে দিয়েছে। সাসপেণ্ড করিয়ে দিয়েছে।

দুটো জিনিসে মানুষের পরমানন্দ। করুণা আর হিংসা। পরচর্চা আর পরনিন্দা এই দুটো ভাব, এই দুটো জলাভূমি থেকে উঠে আসে। করুণা থেকে যা আসে তাতে থাকে নিজের অহঙ্কার। রজোগুণ। আঃ, আমি ভালো আছি। তুমি কারে পড়েছো। এইটি ভাবামাত্রই মনে আনন্দের মধুক্ষরণ। বেশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে। একসময় ঠোঁটে তোমার ফাইভ ফিফটি ফাইভ

নাচতো। বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতের হইহই লেগেই থাকতো। তখনই ভেবেছিলুম—অতি বাড় বেড়ো না। ঝড়ে পড়ে যাবে।

আর হিংসা মিশ্রিত পরচর্চা হল তমোগুণী। কেউ বড় একটি মাছ ঝুলিয়ে বাড়ি ঢুকছে, কি ঝোলাঠাসা বাজার, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীর মন্তব্য—ব্যাটা পয়সার গরম দেখাচ্ছে। নিজের অক্ষমতা থেকেই এমন কথা উঠছে। আমি পারছি না, তুমি পারবে কেন? দেখা যায়, সংসারে গৃহিণীর যখন পেটের গোলোযোগ তখনই যত প্যান্তাখ্যাচাং ঝোল, গলা ভাত। প্রশ্নঃ রাতে কিছু খাবে নাকি? ক্ষিদে নেই, নিজের ক্ষিদে নেই তো হোল ফ্যামেলির ক্ষিদে নেই, এই রকম একটা মনে হওয়া। অন্য সময়, প্যতলা ঝোল ভাত কর না বললে, তেড়ে মারতে আসবে। ও দিয়ে গেলা যায়! যখন দেখা যায় প্রতিবেশী একটি শীর্ণ কুমড়োর ফালি আর একটি শাকের আঁটি নিয়ে বাড়ি ঢুকছেন ছেঁড়া স্লিপার টানতে টানতে তখন স্ত্রীকে ডেকে বলি, আহা, বিধুটার কি অবস্থা হলো গো। এক সময় কি ছিল, আজ কি হয়েছে। এই করুণামিশ্রিত উক্তিতে করুণার চেয়ে নিজস্ব একটা তৃপ্তি আছে। বিধু, তোমার চেয়ে আমি অনেক ভালো আছি। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে আমি কোনও দিন দু'হাত উদার করে এগিয়ে যাবো না। আমি আমার জানালায় বসে দেখবো, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবো।

আমার মনে আছে—আমাদের পাড়ার এক বড়লোক, বিশ-তিরিশটা বাড়ি আর ব্যবসার মালিক, বড় কৃপণ ছিলেন। ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার। হাত দিয়ে জল গলত না। কর্তার শরীর খারাপ বলে স্ত্রী একদিন রাতে গোটা দশ লুচি গাওয়া ঘিয়ে ভেজে কর্তাকে দিয়েছিলেন। সেই লুচি দেখে কর্তার শরীর আরও খারাপ হল। এ তুমি কি করেছ! তুমি কি আমাকে দেউলে করে ছাড়বে। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা ময়দার লুচি। সে প্রায় স্ট্রোক হয়ে যাবার মতো অবস্থা। স্ত্রীর তো মাথায় হাত। লুচি খাওয়াতে গিয়ে বিধবা না হতে হয়? তা সেই ধনকুবেরটি আটহাতি একটা খেঁটে ধুতি পরে চলাফেরা করতেন। ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি ফতুয়া। সবাই বলত—আহা, কি সাদাসিধে নিরহংকারী মানুষ, কোনও চালচলন নেই, ডাঁট নেই, বাবুগিরি নেই। এই হল মজা! আমরা একটা সামান্য কলার ফাটা জামা পরে রাস্তায় বেরোলে হাজার কথা হবে। লোকটার এমন পয়সা নেই, যে একটা জামা কেনে। সারা জীবন কি করলে!

বাড়িতে এসে কেউ চলে যাবার পর, সঙ্গে সঙ্গে সব বসে যাবে তার খুঁত ধরতে। কি ভাবে বসেছিল দেখেছো! কার্পেটটাকে কি করে দিয়ে গেছে! হাতের কাছে

অ্যাসট্রে তবু ছাই ঝেড়েছে ডিভানের চাদরে। চা খেতেও জানে না। ডিশে ফেলে সেণ্টার টেবিলে ফেলে নরক বানিয়ে গেছে। আর একজন বললে—এত বকে। বকেবকে মাথা একেবারে খারাপ করে দিয়ে গেল। এই দ্যাখো, ম্যাগাজিনের পাতায় পাতায় বিস্কুট আর সন্দেশের গুঁড়ো।

রসগোল্লার রস মাখিয়েছে চারপাশে। এরকম লোক এলে দোরগোড়া থেকে বিদায় করে দিও। খবর এল বাথরুম থেকে—লোকটা বুঝি ওখানেও গিয়েছিল। ঢোকা যাচ্ছে না, জল ঢালেনি। শেষ সংবাদ—যেখানে জুতো ছিল, সেখানে কাদা। মানে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেও জানে না।

কিন্তু যখন জানা গেল, লোকটার খুব ক্ষমতা। স্কুলে ছেলে ঢোকাতে পারে। অফিসে লোক ঢোকাতে পারে। ফ্ল্যাট যোগাড় করে দিতে পারে, মেয়ের জন্যে ভালো পাত্র এনে দিতে পারে, রাতারাতি টেলিফোন লাগিয়ে দিতে পারে, তখন আর তিনি লোক নন, ভদ্রলোক। তখন তাঁর সবই প্রশংসার। তখন তিনি খেয়ালী। তাই চা ছলকায়, কার্পেট গুটিয়ে যায়। বাথরুমে জল ঢালতে ভুল হয়ে যায়। একটু অন্যমনস্ক। বেশি বকাটা তখন গুণ। দিলখোলা কি না! তাই হলহলে।

হিসেব নিলে দেখা যাবে, জীবনে এমন একটা মানুষের সঙ্গে দেখা হল না, যে সমালোচনার ঊর্ধ্বে, যার কিছু না কিছু নিন্দনীয় নয়। সেই ঘটনাটা মনে পড়ছে। পরনিন্দা-চক্রে এক জন প্রায় ফুলমার্ক নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একজন বললে—সবই ভালো। কেবল একটাই দোষ—কথা বলার সময় বড় থুতু ছিটকোয়।

একজন বিশ্বনিন্দুক, বিপর্যয় সমালোচককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সকলেই খুব সাবধান। সমস্ত রকম যত্ন দিয়ে রান্নাবান্না করা হয়েছে। কোনও ভাবেই খুঁত ধরার উপায় নেই। তিনি খেলেন। খাওয়া শেষ হবার পর জিজ্ঞেস করা হল—কি সব ঠিক আছে তো। তিনি রুমালে হাত মুছতে মুছতে পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বললেন—হ্যাঁ হয়েছে ; তবে কি জানেন, মাংসের ঝোলটায় আর একটু নুন হলেই সব মাটি হয়ে যেত।

পৃথিবীতে কতগুলো সত্য আছে, তার মধ্যে কিছু স্বতঃসিদ্ধ, যা হবে হতে বাধ্য ঃ যেমন ঃ

স্ত্রী স্বামীর নিন্দা করবেন,

স্বামী স্ত্রীর নিন্দা করবেন,

লেখক লেখকের, শিল্পী শিল্পীর, ডাক্তার ডাক্তারের, ছেলে বাপের,

এক মিস্ত্রি আর এক মিস্ত্রির, এক ফটোগ্রাফার আর এক ফটোগ্রাফারের। রুগি ডাক্তারের। যে লণ্ড্রিতে কাপড় জামা কাচানো হয় তার নিন্দে না করে তো জলগ্রহণ করাই উচিত নয়। যে সেলুনে চুল কাটা হয় সেই সেলুনের। মুদির। স্টেশনারি দোকানের। কর্মচারী নিন্দা করবেন ওপরঅলার, জনগণ করবেন সরকারের। রাজ্য সরকার করবেন কেন্দ্রের। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা করবেন যুগের। সমালোচক করবেন—সাহিত্যের, শিল্পের, সংস্কৃতির। আর সবার ওপরে মানুষ সত্যের মতো—সেই খোদা, স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁর চর্চা এমন এক পরচর্চা, যে চর্চায় লাভ বই লোকসান নেই।

pathagar.net

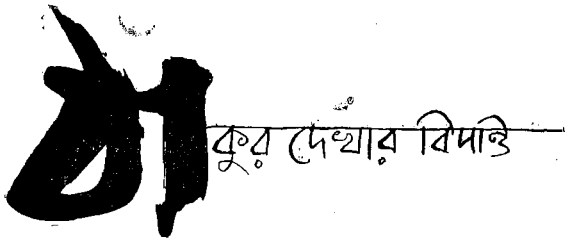

ছোটরা বায়না ধরবেই। ঠাকুর দেখতে চলো। ব্লেডের ঠাকুর। পেরেকের ঠাকুর। ছোবড়ার ঠাকুর। জলের ঠাকুর। অদৃশ্য ঠাকুর। ডিস্কো ঠাকুর। বিস্কুটের প্যাণ্ডেলে চায়ের ঠাকুর। ঠাকুর দেখার আগে, দ্যাখো প্যাণ্ডেলের বাহার। অজন্তা, ইলোরা, সোমনাথ, মীনাক্ষী, মসলিপুরম, ল্যাঙ্কাস্টার হাউস, হোয়াইট হাউস, সাঁসেলিজা, শোলাপুরে।

ডেকরেটাররা আজকাল ভেলকি দেখাতে পারেন। দুটো বাড়ির মাঝখানে সামান্য ফাঁক ছিল। উঠে গেল বাঁশের, চটের, চাটাইয়ের কারিকুরিতে তিলতলা বাড়ি। চোখ টেরা। ময়দানবের খেলা। আসল, নকল বোঝা দায়। বৈঠকখানায় মা বসেছেন আসর সাজিয়ে। সরস্বতী সেতার বাজাচ্ছেন, লক্ষ্মী টাকা গুনছেন, কার্তিক যেন পুরনো কলকাতার বাবু। অসুর ডনবৈঠক মারছেন।

ঠাকুর দেখার দায়িত্ব ক্রমশই বাড়ছে। প্রথমে দ্যাখো আলো। চন্দননগরের মাথা বটে! আলোর হাতি বল খেলছে। আলোর মেয়ে সাইকেল চালাচ্ছে। আলোর গিন্নি ঝ্যাঁটা মারছে। আলোর বেড়াল ইঁদুর ধরছে। আলোর ভক্ত বাঁক কাঁধে তারকেশ্বর ছুটছে। সারা শহর জুড়ে আলোর কেলেঙ্কারি। মাথার ওপর আলোর মালা। ধরধর করে আলো ছুটছে। আলোর চোরপুলিশ।

আলোর পরে প্যাণ্ডেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দ্যাখো। পারলে পড়ে নাও বিবরণ। কোন ঐতিহাসিক স্থাপত্যের অনুকরণ। এইবার গিজি গিজি ভিজি ভিজি ভিড়ে নিজেকে ফেলে দাও। ভিড়ই ঠেলতে ঠেলতে এদিক দিয়ে ঢুকিয়ে ওই দিক দিয়ে বের করে দেবে। লাউড স্পিকারে ঘনঘন ঘোষণা, পকেট সামলে, ঘড়ি সামলে, হার সামলে, দুল সামলে। এরই মাঝে হারিয়ে যাবার ধুম পড়ে যাবে। ছিড়িক গান, আকাশবাণীর কায়দায় ভারি গলার ঘোষণা—উল্টোডাঙ্গার মধুমতী, তোমাকে তোমার জগা খুঁজছে। যেখানেই থাকো আমাদের এনকোয়ারির সামনে চলে এসো। গান, প্রভু আরও আলো, আরও আলো। হাওড়ার বক্রেশ্বরবাবু, আপনাকে আপনার স্ত্রী ভামিনী দেবী গরু খোঁজা খুঁজছেন। এইসব শুনতে শুনতে, শুনতে শুনতে, গোঁত্তা খেতে খেতে, মা দুর্গে, অসুরনাশিনী মা, আর যে পারি না।

ছোটদের হাত ধরে বেরোতেই হবে। না বেরুলে চাকরি যাবে দাদুর। সংসারের দানাপানি বন্ধ হয়ে যাবে। বউমা বলবে. যান না বাবা, বসে না থেকে, বাচ্ছাটাকে একটু ঠাকুর দেখিয়ে আনুন না। বৃদ্ধ চললেন। ছেলে ষাট টাকা দামের একটি তাঁতের ধুতি দিয়েছে। খাদি থেকে কেনা রিডাকসানের পাঞ্জাবি। চোখে ছানি কাটা চশমা। সে এক করুণ দৃশ্য। মধুরও বটে। শিশুর অসংখ্য প্রশ্ন। দাদু অসুর কেন উল্টে আছে? উত্তর, মা দুর্গা উল্টে দিয়েছেন। প্রশ্ন, কখন সোজা করবেন? উত্তর, কৈলাশে গিয়ে। প্রশ্ন, অসুর কেন সিংহকে মারছে না? সিংহ কেন অসুরকে খাচ্ছে না? উত্তর, ক্ষিদে নেই দাদু। প্রশ্ন, অসুর ভিটামিন খায় দাদু? অসুরের মা নেই? প্রশ্নে, প্রশ্নে দাদু অস্থির।

বউকে নিয়ে স্বামী না বেরোলে স্বামীর চাকরি যাবে। কার্তিকের স্ত্রীর তো ছোঁড়াই হল না। আজীবন হাতেই ধরা রইল। মা তো একাই একশো। দশটা হাতে দশ রকমের অস্ত্র। বাহন আবার সিংহ। যুদ্ধটা যদিও খুবই সেকেলে। পারমাণবিক যুগে অচল। মায়ের হাতে কবে যে স্টেনগান ধরানো হবে। অসুরের হাতে ক্ষুর আর বোতল বোমা! কে জানে। তা স্ত্রীর বাক্যবাণ বড় সাংঘাতিক। হৃদয় ঝাঁজরা করে দেয়। 'বচ্ছরকার এই তিনটি দিন বাড়িতে বসে বসে হেঁসেল ঠেলো। এমন জীবনের মুখে ঝাড়ু মারি।'

'ঠাকুর কী দেখবে? দেখার কী আছেটা! সেই তো এক পোজ, এক ধুনুচি-নৃত্য। মাইকের ঘ্যারোর ঘ্যারোর। কোদলানো রাস্তা, ভ্যাড়ভ্যাড়ে কাদা, গ্যাদগ্যাদে লোক। ভালো লাগে?'

দ্যাখার না থাক দ্যাখাবার তো থাকে। ইনস্টলমেণ্টে এত শাড়ি কেনা হয়েছে।

আলমারিতে লাট খাবে। নতুন নতুন শাড়ি পরে মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছেন। উন্মাদিনীর মতো হকের পল্লী থেকে ছুটছেন বিরাশির পল্লীতে। পথের মাঝে কেউ কেউ থেমে পড়ে শাড়ির ভাঁজ ঠিক করছেন। নিচু হয়ে তলার দিক থেকে টেনে টেনে ঝুলের গরমিল মনোমত করছেন। অন্যের শাড়ি দেখে স্বামীকে ফিসফিস করে বলছেন, 'দ্যাখো দ্যাখো তানচৈ বেনারসী। তোমার জন্যে কেনা হল না। টেরিরিফিক।'

স্বামী শাড়ি দেখতে গিয়ে মনে মনে গেয়ে উঠলেন, 'চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি তোমায় দেখে ফেলেছি।' আবার যাঁদের সদ্য একটি হয়েছে তাঁদের মহাজ্বালা। লক্ষ্মণের শ্রীফল ধরার মতো, ধরে ধরে পেছন পেছন ঘুরে বেড়াও। 'লতু, গোটা সতেরো তো হল। টেংরি খুলে যাবার যোগাড়।

এইবার চলো না, প্যাভেলিয়ানে ফেরা যাক। 'না, সেঞ্চুরি না করে আমি ফিরবো না।'

ইচ্ছের ঠাকুর দেখা আর অনিচ্ছার ঠাকুর দেখা, দুইয়ে মিলে পুজোর কটা দিন জমবে ভাল। বয়েসে যারা তরুণ তারা প্রাণের টানে পথে নেমে আসবে। মা তো উপলক্ষ। আসল লক্ষ্য, এমন দিন বছরে একবারই আসে মা তারা। ললিতা বিশাখা, সিল্ক, জর্জেট, শিফন, নাইলন। হাইহিল, ফ্ল্যাট হিল। দিশি, বিলিতি সুগন্ধ। কলকাতার নরকে স্বর্গের ব্র্যাণ্ড। এরই মাঝে, ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করে, টইটম্বুর ফুচকা, অসীম কায়দায়, সামনে ঝুঁকে শাড়ি বাঁচিয়ে মুখে ঠেলা। অষ্ট সখী ঘিরে ধরেছে ফুচকা শিল্পীকে। তার গায়ে আজ নতুন জামা উঠেছে। কাঁধের গামছাটিও নতুন। পাশ দিয়ে চলেছে কুচকাওয়াজ। ছেলে, বুড়ো, যুবক, তরুণী পিলপিলিয়ে চলেছে। মাইকে মাইকে শব্দব্রহ্ম। কোনওটায় বম্বের হিট হিরো হিট ফিল্মের ডায়লগ ছাড়ছে, মহব্বত, ইনসান, মওত, কুত্তে, সরাফাৎ, হকিকৎ, হাম, তুম, আজা, লড়কন, ধড়কন শব্দের জগাখিচুড়ি কানের ভেতর দিয়ে মর্ম স্পর্শ করছে। বাঞ্ছারামের গলিতে স্যাঁতানো ঝুরে পড়ে আছে প্রত্যহের সংসার। খাটের ওপর বেরোবার আগে শ্রীমতী ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছেন বাড়িতে পরার শাড়ি। চেয়ারের পেছনে ঝুলছে প্রত্যহের পাজামা। মেঝেতে হাল্কা হয়ে ছড়িয়ে আছে প্রসাধনের পাউডার। চিরুনি থেকে চুল ছাড়ানো হয়নি। টিপের পাতা মোড়া হয়নি। ড্রয়ারের ডালা বন্ধ হয়নি। পাখার সুইচ অফ করা হয়নি।

আলো, শব্দ, গান, আনন্দের জোয়ার বইছে। ছোটখাটো সমস্যারও শেষ নেই। জোজোর নতুন জুতো ফোস্কা উপহার দিয়েছে। সে আর হাঁটতে পারছে

না। জুতো এখন বগলে। জুলির হাই হিলের একটা হিল খুলে পড়ে গেছে। বউদির শাড়ির আঁচল বাঁশের পেরেকে আটকে ফালা। দাদা এক রাউন্ড ঝেড়ে, পাল্টা ঝাড় খেয়ে পাশে পাশে এমন গোবদা মুখে চলেছে যেন বড়লোকের বাড়ির দারোয়ান ভজন সিং। লিলির পেছনে এক ডনজুয়ান লেগে গেছে। যে প্যাণ্ডেলে যাচ্ছে, সেই প্যাণ্ডেলেই পেছন পেছন। মাকে বলছে, 'ও মা, ওই দ্যাখো, মুখপোড়াটা এখানেও এসেছে।' মা বলছেন, 'তাকাসনি। তাকিয়ে মরছ কেন?' এরই মাঝে দু চারটে মারামারির সাক্ষী হতে হবে। সেই এক সমস্যা, হয় নারী না হয় পকেটমার।

আজকাল আবার ঠাকুর দেখার হোলনাইট হয়েছে। ইটখোলার লরি ভাড়া করে রাত এগারোটা নাগাদ পাড়া কাঁপিয়ে বেরিয়ে পড়ো। লরিতে একপাল ছেলেমেয়ে। কোনও কোনও রক্ষণশীল বাড়ির মেয়ের সঙ্গে অভিভাবক হিসেবে কোলের ভাইটিকে পাউডার টাউডার মাখিয়ে তুলে দেওয়া হয়েছে। 'আমারা বাবা মেয়েকে কোথাও একলা ছাড়ি না। সঙ্গে সাক্ষিগোপাল। এক লরি ছেলে মেয়ের চিৎকারে দশ দিক কম্পিত করে ছুটলো টালা থেকে টালিগঞ্জ। হোলনাইটের জন্যে অষ্টমী আর নবমীই হল দিন। নবমী হলে মহা মজা। সকালে ফিরে এসে বিছানায় লেটকে পড়ো। বিজয়ার বাজার থেকে দায়মুক্ত। স্ত্রী বলবেন স্বামীকে, 'যাও, তুমিই নিয়ে এস, বোঁদেটা একটু শুকনো এনো। ঘুগনির মটোর একটা একটা করে দেখে নিও, বড় পোকা থাকে। নারকোলটা বাজিয়ে নিও। রসগোল্লা টিপে নিও। দালদানিও গাছ মার্কা। খোকাকে আর ডাকবো না। সারা রাত জেগে ঘুমিয়ে পড়েছে। উৎসবের দিনে, কিছু কিছু ছাড়পত্র পাওয়া যায়। কেউ কেউ চুক করে সামান্য হুইস্কি মেরে চোখ ঈষৎ আরক্ত করে একটু তদন্তে বেরোন। 'আহা! মা কি সেজেছেন।' 'কোন মা?' তোমার চোখ তো ভাই প্রতিমের দিকে নেই!' 'আরে ভাই, যে মা খাটে, সেই মা-ই তো পটে। আমি জ্যান্তো, দ্বিভুজা দুর্গা দেখছি। মা কি সেজেছেন। টাঙ্গাইলের খোলে সুঠাম দেহছন্দ। শ্যাম্পু করা চুল, পিঠে আলুলায়িত। অসুর আমি এ-পাশে মূর্ছিত। আসছে বছর আবার এসো মা।'

pathagar.net

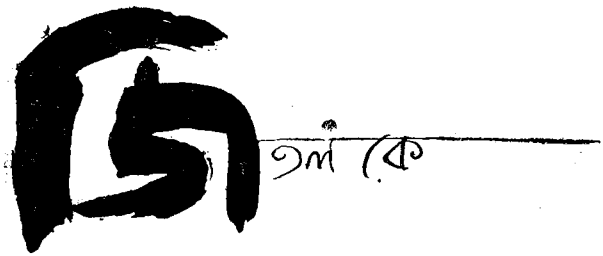

নির্বাচন এসে গেলে আমার ভীষণ মজা লাগে। এই আলু, পটল, ঢ্যাঁড়স, কুমড়োর জীবনে বেশ বড় রকমের একটা উত্তেজনা। যেন টেস্ট ক্রিকেট অথবা ওয়ান ডে ম্যাচ! যেন ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের লড়াই। পশ্চিম বাংলায় এখন যা হচ্ছে তা হল রাজীব জ্যোতির শিল্ড ফাইন্যাল।

হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার মতো, এ ওর ঘরের খবর ও এর ঘরের খবর মার্কেটে ফাঁস করে দিচ্ছে। সেইটাই তো মজা। আমরা আদার ব্যাপারি, আমাদের জাহাজের খবরে কী দরকার। আমরা ঘরের খবর জানতে চাই। আমরা চাই কোঁদল। অল্পস্বল্প মারদাঙ্গা হলেও ক্ষতি নেই। যে পুজোর যা নৈবেদ্য। নারকোলের বদলে ভোটপুজোয় নারকুলে বোম পড়লে ষোড়োশোপচার সিদ্ধ হল। ভোট দিয়ে কোনও দিন মানুষের বরাত ফেরেনি, ফিরতে পারে না। ভোট দিলে ব্যাঙ্ক ব্যালেনস বাড়ে না। বেকারের চাকরি হয় না, রেশনে বাসমতী চাল আসে না, স্টপেজে দাঁড়ানো মাত্রই আধখালি বাস আসে না, মাইনে বাড়ে না, বিনাপণে মেয়ে পার করা যায় না। ভোট একটা শুদ্ধ, সাত্ত্বিক, জীবন ছাড়া ব্যাপার। দিতে হয়। দাতার মতো দিতে হয়। দিতে দিতে নাঙ্গা বাবা হয়ে যেতে হয়। প্রত্যাশা কোরো না প্রত্যাশা একটা নীচতা। উদার মন নিয়ে ফুটো বাক্সে পয়সা ফেলার মতো ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করে ফেলে দাও।

কেউ যদি এম এল এ হয়, কি মন্ত্রী হয় হোক না। হয়ে বেশ একটু ইয়েটিয়ে করে নিক না। দিন তো চিরকাল কারুর সমান যায় না। জীবন তো আজ আছে কাল নেই আর গদি, সে তো আরও ক্ষণস্থায়ী। ভোটের ব্যাপারে চাই পরমপুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি। নীর আর ক্ষীরের মিশ্রণ থেকে ক্ষীরটুকু হাঁসের মতো শুষে নিতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে ভোটের ক্ষীর হল বহু রকমের মজা। প্রথম হল কথার লড়াই। কার কথার কত ধার! ওদিক থেকে রাজীববাবু ছাড়ছেন, এদিক থেকে জ্যোতিবাবু। উনি বলছেন তিনশো কোটি টাকা গেল কোথায়। এদিক থেকে উত্তর, টাকা দিয়েছেন না কি! ওদিক থেকে প্রশ্ন, কেন্দ্রের কাজে কেন বাধা দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিম বাংলার উন্নতি কি চান না! এদিক থেকে উত্তর, লায়ার। ওদিক থেকে প্রতিশ্রুতি, জিতে গদিতে বসলেই দশ লক্ষ বেকারের চাকরি। এদিক থেকে ফুৎকার, চাকরি কি ছেলের হাতের মোয়া, না গাছের ফল! নাড়া দিলেই পাকা আমলকির মতো ঝরে পড়বে! ওদিকের প্রতিশ্রুতি, গদিতে বসলেই দু টাকা কিলো যোজনগন্ধা চাল। এদিকের কুঁক কুঁক হাসি, সে চাল কোন ক্ষেতে ফলে মাইরি। এই যে উত্তর চাপান, এ যেন রবিশঙ্করের সেতার। আর জাকির হোসেনের তবলার সওয়াল-জবাব।

যাক একটা উপকার হচ্ছে, দাঁত বের করা দেয়াল, যার গায়ে সারা বছর জল-বিয়োগ হত, সেই দেয়ালে এক পোঁচড়া করে হোয়াইট ওয়াশ পড়েছে, তার ওপর জমে উঠেছে কবির লড়াই। দেয়ালের লিখন আমাদের কপালের লিখনকে খণ্ডাতে পারবে না। কপালে যা লেখা আছে তা ফলবেই। সকালে শয্যা ত্যাগ, সারা দিন হা অন্ন, হা অন্ন। মধ্যরাতে ধুপুস। ঘণ্টা সাতেক নাসিকা গর্জন। প্রাতে সংবাদপত্র। সেখানে নিরন্তর গবেষণা, অমুক জেলার তমুকচন্দ্র বলেছেন, এম এল এ মশাই একবারই এসেছিলেন পাঁচ বছর আগে, তারপর আর তিনি এলাকা মাড়াবার অবসর পাননি। কল আছে জল নেই। টিউবওয়েল আছে হাতল নেই। গর্ত আছে রাস্তা নেই। ছাত্র আছে স্কুল নেই। কথা আছে কাজ নেই। অমুক এলাকায় দু দলের প্রার্থীই জোরদার। ধনাদা আর নোনাদা। লড়াই খুব জমবে। তমুক এলাকায় ভোট ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়ে আশাতীত ফল হবার সম্ভাবনা।

ব্যস্ত সাংবাদিকরা পাগলের মতো এলাকায় এলাকায় টহল মারছেন। ইলেকসান ফোরকাস্ট। পরে মেলানো হবে। মিলিয়ে নম্বর দেওয়া হবে। তখন আবার আর এক মজা, কোন কাগজ বেশি মেলাতে পেরেছে, কোন কাগজ পারেনি।

রাজীব একাদশ ভার্সাস জ্যোতি একাদশ। রাজীব হলেন বিলিতি কোচ, সেণ্টার ফরোয়ার্ড প্রিয়দাশ। সাঁসাঁ করে বল নিয়ে ঢুকছেন, একাই ড্রিবল করছেন, বিশেষ থ্রু-পাশ দিচ্ছেন না। এ টিমের দুর্ধর্ষ ব্যাক জ্যোতিবাবু। একাই ডিফেন্ড করছেন।

এবারের খেলাটা আর ফুটবল নেই, হয়ে গেছে ব্যাডমিণ্টন। চাপসা চাপসি। রাজীববাবু ও কোর্ট থেকে হাঁকড়াচ্ছেন, এ কোর্ট থেকে ফেরাচ্ছেন জ্যোতিবাবু। জ্যোতিবাবু মারছেন এপাশ থেকে রাজীব পেস্স করছেন ওপাশে। কে এখন চ্যাম্পিয়ান হবেন দেখা যাক। দু' হাতেই ভাল মার রয়েছে।

আজকাল আর নির্বাচনী সভা তেমন জমে না। মানুষ বক্তৃতা শুনে শুনে ক্লান্ত। সাংবাদিকরা বলছেন, আমরা ভোটাররা না কি বেশ বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছি, অনেকটা সে-যুগের অত্যাচারিতা কুল-বধূর মতো। যাদের বুক ফাটত ; কিন্তু মুখ ফুটত না। মনের কথা মনেই ধরা আছে, আমরা মুখে কিছু বলছি না। বলব ফুটো বাকসে নিভৃতে ফেলা একটি ব্যালটে। তবে যে পুজোর যা মন্ত্র। পথসভা করতেই হয়। ওদিকে পাতাল রেলের ঘ্যাজোরম্যাজোর। বিশাল বিশাল বকরাক্ষসের মতো চিরুণদাঁতী যন্ত্র মাটি কোদলাচ্ছে এদিকে পাশের সুঁড়ি গলিতে আধো অন্ধকারে একটি মাইক নিয়ে গলি-সভা করছেন ক্যাণ্ডিডেট। সমানে এক ডজন মাত্র শ্রোতা। তা হোক থেকে থেকে বন্ধুগণের সম্বোধন দিয়ে, নরম গরম সে কি আস্ফালন। প্রতিবারই নির্বাচনের প্রাক্কালে বিপ্লবীদের শ্রীমুখ থেকে কত কী ঝরে পড়ে। শুনলে, পুলক, হর্ষস্বেদ, কম্প শাস্ত্রোক্ত সমস্ত লক্ষণই শরীরে ফুটে ওঠে। দিন আগত ওই। ২৩-এর পর ২৪-এর রাতটা পার হয় কি, হয় না, দেশটা এঁদের হাতে একেবারে অন্য চেহারা নেবে। পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি সকলই ফুটিল। আধো অন্ধকারে রক্তা অদৃশ্য শত্রুর দিকে থেকে থেকে ঘুঁসি ছুঁড়ছেন আর ঘিসিংঘিসিং করছেন। যাক তবু এই সময় আমরা ভোটাররা মাসখানেকের জন্যে অন্তত এদলের ওদলের বন্ধু হয়ে ওঠার সৌভাগ্য লাভ করি। তারপর চুকেবুকে গেলে কে কার বন্ধু। আবার পাঁচ বছরের জন্যে আমরা যে যার সব মায়ের ভোগে চলে যাব।

'ও দাদা, তুমি যে তখন অত সব বললে, হ্যাম করেঙ্গা ত্যাম করেঙ্গা, তা কী হল ভাই! আমরা ফি দিলুম, তোমরা তো এক পুরিয়াও মেডিসিন ছাড়লে না।' দাদা বললে, 'দূর মুখ্যু, ভোটের পর বোতলের জল আর ফ্যাঁস করে না কি!' সে গল্পটা কী গুরু। তাহলে শোনো। আদর করে ভোটার ধরে আনা হয়েছে। প্রার্থীর ক্যাম্পে বসিয়ে তাকে লেমোনেড সেবা করানো হচ্ছে। ছিপি খুলতেই

জল ফোঁস করে উঠল। তিনি ভোট দিয়ে বেরনোর পর আর এক বোতল জল চাইলেন। এবার পেন্ন সাদা জল। নে ব্যাটা খা। ভোটার বললে, এ কি ফোঁস করল না যে! সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীর চেলারা বললে, ভোটের পর জল আর ফোঁস করে না। যা ব্যাটা বাড়ি যা।

এই নির্বাচনের সময়, ভোটাররা দুটি প্রাচীন গান স্মরণে রাখতে পারেন। একটি গান রামকুমারবাবুর গলায় প্রায়ই শোনা যায়—বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে ধরো মুখে মা, মা বুলি/গলার কাঁটা সরে গেলে মাকে সবাই যায় ভুলি। এখানে মা হলেন ভোটার। ভোট দাও, কলাপোড়া খাও। আর একটা গান ভোটের সময় ভোটারদের সব সময় গুণগুণ করা উচিত—'তুমি কে, কে তোমার, বলে জীব করে আকিঞ্চন' কে তোমার ভাই! বন্ধুগণ বলে বটে, তবে সত্যিই কি কেউ কারুর বন্ধু। নির্বাচনের পর কোন নেতা বা মন্ত্রীর কাছে যাও না, তখন দেখতেই পাবে তুমি কেমন বন্ধু। একটা জিনিস আমাদের বোঝা উচিত নেতা বা মন্ত্রী বা এম, এল, এ কজনকে সন্তুষ্ট করতে পারেন! সবাই তো হাঁ করে আছে, খাবি খাচ্ছে। আগে নিজের লোক, চামচাদের খাইয়ে তারপর তো অন্য সকলে। তারপর নিজের কথাও তো ভাবতে হবে? এ তো আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো নয়। সোনার হরিণ ধরতে ছোটা। উদভ্রান্তের মতো গলাবাজি, প্রাণভয়, মারদাঙ্গা, এর কোন প্রতিদান থাকবে না! এমন হতে পারে! দেশ সেবার জন্যে অকারণে কেউ হাঁকোরপাকোড় করে! এমনিই তো দেশে চাকরি বাকরির এই অবস্থা! বিরাট বিরাট, বিশাল বিশাল শিক্ষিত ব্যক্তি গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। দাড়িকামাবার ব্লেড কেনারও পয়সা নেই। সংসারপাতার রেস্তো নেই বলে প্রেম বেড়ে যাচ্ছে। মশা আর প্রেম দুটোই বাড়ছে। কোনও স্প্রে দিয়েই বাগে আনা যাচ্ছে না। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে দেশসেবার মতো জীবিকা আছে! প্রথম দিকে একটু হাঁটাহাঁটি, চিৎকার চেঁচামেচি করতে হবে; তারপর তো সোজা পথ। বক্তৃতার একটা পেটেন্ট আছে। সেইটা আয়ত্ত করা খুব একটা কঠিন কিছু নয়। যাত্রার যেমন হাসি রাজনীতির তেমনি বক্তৃতা। অনর্গল বলে যেতে হবে। শব্দ আর শব্দ। মানেটানে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। গলা এই তোলো এই নামাও। ধমকে ধমকে, গমকে গমকে বলে যাও। শুধু হোঁচট খেও না। হোসপাইপে জল দেবার মতো মুখের পাইপে শব্দ দিয়ে যাও মানুষকে বক্তৃতা ছাড়া আর কী-ই বা দেবার আছে। এর বাইরে কিছু দিতে গেলেই নিজেদের ভাঙ্গে টান পড়ে যাবে। বক্তৃতা ছাড়া আর কিছু দিতে হলে মেটিরিয়্যাল কিছু না দেওয়াই ভালো। রাখতে পারবে না, যত্ন নেই, নষ্ট করে

ফেলবে। অ্যাবস্ট্রাক্ট দাও। যেমন মতবাদ, যেমন ত্যাগের আদর্শ। পরনের কাপড়টা পর্যন্ত খুলে দাও বন্ধুগণ। একটাকা রোজগার হলে আশি পয়সা ট্যাক্স দাও। দেশের জন্যে সেবকদের হাতে দিতে শেখো। বেদান্তের দেশ, ধর্মের দেশ। শোননি, ভোগ একপ্রকার রোগ বিশেষ। তোমাদের হাতে একটা পার্ক দেওয়া মানে, গোঁজেল আর সমাজবিরোধীদের আড্ডা হওয়া। রাস্তা দেওয়া মানেই এ ও সে এসে গর্ত খুঁড়বে। হাসপাতাল দেওয়া মানে বাড়ির লোকের দায়িত্ব কমিয়ে দেওয়া, পারিবারিক বন্ধন শিথিল হতে দেওয়া। আপনজন অসুস্থ হলেই, দাও তাকে হাসপাতালে, বেশ মজা! হাসপাতালের পরিবেশ আমরা ইচ্ছে করে এমন করে দিচ্ছি যাতে যাবার নাম করলেই ভয়ে আতঙ্কে রোগ ভালো হয়ে যায় বা যে শুধু ভোগাবে, ভোগাতে ভোগাতে গেরস্থকে সর্বস্বান্ত করে সেই মায়ের ভোগেই যাবে, হাসপাতাল যেন সেই যাওয়াটাকেই একটু কুইক করে দেয়। আধুনিক ভাষায় একে বলে রিভার্স প্ল্যানিং। যাঁরা গাড়ি চালান তাঁরা জানেন ব্যাক গিয়ারে গাড়ি চালানো কত শক্ত! সেই শক্ত কাজটাই এখন করা হচ্ছে। ভোটারদের কাছে একটিই নিবেদন, চাইবেন কেন, চেয়ে নিজেকে ছোট করবেন কেন! জীবন যে রকম না চাইতেই পেয়েছেন মৃত্যুও সেইরকম না চাইতেই পাবেন। জীবনের এই তো সবচেয়ে বড় দুটো পাওনা। এর মাঝে ছুটকো ছাটকা ছ্যাঁচড়া ব্যাপার নিয়ে কেন মাথা ঘামানো!

এবারের নির্বাচনের গোটাকতক ইস্যু চোখে পড়ছে। রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতা, আমার হাতে নয়। রাজ্যের হাতে আরও টাকা, আমার হাতে নয়। জাতীয় সংহতি ও ঐক্য। দলীয় সংহতি বা ঐক্য নয়। দল কাঁচের গেলাসের মতো টুকরো হয়ে যাক। এবারে তো একই কেন্দ্রে একই দলের একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন-পত্র জমা দিয়েছিলেন। অবশ্য এব্যাপারও শাস্ত্রসম্মত। সেই আমরা শুনে আসছি না! নৈকষ্য-কুলীন আর ভঙ্গ-কুলীন। দল, ভঙ্গদল, ভঙ্গ ভঙ্গ দল। হোমিওপ্যাথির ডাইলিউশান। যত ডাইলিউট হচ্ছে তত সেবা করার পোটেনসি বা রস বাড়ছে।

সে যাই হোক, ওইটাই ভালো লাগে, যুদ্ধ শ্রীচৈতন্য বা তীর্থঙ্কর যেন মাধুকরীতে বেরিয়েছেন। ধুতি পাঞ্জাবি পরা বৃষকাষ্ঠের মতো প্রার্থী এসে দাঁড়িয়েছেন গৃহস্থের শ্যাওলাধরা অঙ্গনে। আসেপাশে সুস্মিত সংকীর্তনের দোয়ারকির দল। প্রার্থী মধুর হেসে মাথাটি নত করলেন, 'আশীর্বাদ করুন মা'। মাথা তুললেন। করুণ মুখচ্ছবি। সন্তান যেন সন্ন্যাস নিয়ে বিদায় নিতে এসেছেন। এরই মাঝে একজন ভেটারেন প্রার্থী আছেন, তিনি কখনও হারেন,

কখনও জেতেন, তাঁর টেকনিক হল, মা বলেই ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলা।

তারপর! অন্য দৃশ্য। বিজয়ী প্রার্থী মিছিল করে লরির মাথায় চেপে চলেছেন। ঘাড় উঁচু। গলায় মালার পরে মালা, মাথায় আবীর। চেলাদের চেহারা নিমেষে চামুণ্ডায় রূপান্তরিত। বিশাল চিৎকার। বিপুল পটকা-বিস্ফোরণ। জিতলো কে? আবার কে? আনতমস্তক সেই প্রার্থীর তাকাবার ধরনটাই তখন আলাদা। উদ্ধত সুদূর। তিনি তখন আর সাধারণের নয়, দলের। পার্টির একজন। সাধারণের তিনি কেউ নন। সংখ্যা-গরিষ্ঠ শাসক দলের একটি সংখ্যা মাত্র।

Pathagar.net

নববর্ষের নকসা

চৈত্রের শেষ দিন। ট্যাট্যাং ট্যাট্যাং করে ঢাকে যেন সজনে ডাঁটার চাঁটি পড়ল। গেরুয়াপরা বাবার উপোসী চ্যালা আর চেলীরা বাবা তারকনাথের সেবায় লাগি বলে নেচে কুঁদে বছরটাকে ফুঁকে দিলেন। ছোট কল্কের চড়া টান। ভাঙা গালে আধপো কড়ুয়ার তেল ধরে যায় এমন গাব্বু। ওদিকে হুসহাস কলের গাড়ি প্যাঁকপ্যাঁকিয়ে ছুটছে। গাড়ির ভেতর ফিতে গান বাজছে, জমানা বদল গিয়া। সুর্মা সুন্দরী রাজা সিগারেট টানছেন। পাশে ডেনিমপরা ঝুমকো চুলো ছেলে বন্ধু। বুকের কাছে ফটো যন্ত্র! ওদিকে চড়ক গাছে গজাল গেঁথা ছোকরা দুলছে। মেলায় বিকোচ্ছে শহুরে গার্দা। কাঁকরকাটা ঝকঝকে লোহার থালা, গেলাস, বাটি, ঘটি। প্লাস্টিকের গয়না। অম্বলের ওষুধ। ধনেশ-পাখির তেল। বোম্বে ছবির নায়ক-নায়িকার রঙ-করা ফোটো। এসেছে পাঁচালি। ছুরি, কাঁচি, বঁটি, কাটারি। চিনেবাদাম বালির কড়াতে হুড়োহুড়ি করছে। পাতলা রসে গরম জিলিপির ওপর ধুলোর পোঁচড়া পড়ছে। যুবকরা সব গলায় রুমাল বেঁধে চোয়াড়ে গলে সস্তার সিগারেট ফুঁকছে আর আড়ে আড়ে ডাঁসা মেয়েদের দিকে তাকাচ্ছে। গাজনের মেয়েরা গাছতলায় এখানে ওখানে হেদিয়ে পড়েছে। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে হাঁটু ছেতরে বসে আছে। বেওয়ারিশ

বাচ্চারা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে এতে ওতে ঝটাপটি লাগলেই আধো মুখে কাঁচা খিস্তির খই ফুটছে! ঢাকীরা ডিঙ্গি মেরে মেরে চ্যাড়াক চ্যাড়াক বোল ছাড়ছে। কারুর ঠোঁটে বিড়ি নাচছে। পাশের পানাপুকুরে কমলিরা গতর ঠাণ্ডা করছে। যা গরম পড়েছে বাপস। মা নেওটো ছেলে কোল ছাড়তে চাইছে না। বুকের চুষী খুঁজছে ঢুঁ মেরে মেরে। গোটা কতক বুড়ো হাবড়া ঘোলাটে চোখে ইতিউতি চাইছে। এখনও আশ মেটেনি। হাতে ছেলে বিউনি লাল তাগা বেঁধে নন্দ মিস্ত্রীর গায়ে গতরে বউ চিমসে তেলে ভাজা কড়ায় তুলছে আর ফেলছে। পোদ্দার পাশে দাঁড়িয়ে মশকরা মারছে। মুফতে যা মেলে। চাপদাড়ি কলকাতার বাবু ক্যামেরার চোখে সংস্কৃতি খুঁজছে। কাগজে আর্টিকেল লিখবে। একটা গরুর এই মোচ্ছবে পেট আলগা হল। থ্যাসথেসিয়ে নেদে দিলে। আর ঠিক সেই সময় পরানমাঝির পোলা আগুনে ঝাঁপ খাচ্ছে। দাঁতের কালো মাজনের গুণ গাইছে ক্যানভাসার। যৌবন নেতিয়ে গেলে কি দাওয়াই খাবে হাঁকছে হাকিম। এরই মাঝে সূর্য পশ্চিম আকাশে পটকে গেল। টুপুস টুপুস আলো নেচে উঠল এপাশে ওপাশে। মন্দাকিনী যাত্রাপালার কনসার্ট এক রাউণ্ড বেজে গেল। হেভি নাটক, পতির কোলে সতীর পুণ্য। মেয়ে মদ্দ সব মাঠ ভেঙ্গে ওগো চলো গো, ওগো চলো গো, বলে পালের মতো তেড়ে আসছে।

বছর ঘুরে গেল। কোথাও মালক্ষ্মী, কোথাও অলক্ষ্মী। কেউ ফুলে ফেঁপে কোঁদলা হল। কারুর গায়ে খড়ি। কেউ করে ধানের হিসেব, কেউ করে খড়ের হিসেব। শহুরে খেটে খাওয়া মাসকাবারী বাবুরা মায়ের ভক্ত। আবার ওদিকে যারা গদিতে গজকচ্ছপের মতো গড়াতে গড়াতে সারা জীবন কেবল ভাও কিতনা, ভাও কিতনা করছেন তাঁদের অবশ্য তারকেশ্বরে খুব মতি। সে আবার মজা মন্দ নয়। ছোকরারা শেঠের দেওয়া গেঞ্জি, প্যাণ্ট গতরে চড়িয়ে, কোমরে নতুন তোয়ালে জড়িয়ে কাঁধে বাঁক নিয়ে ছুটছে ভোলে বোম, তারক বোম, ঘণ্টা বাজছে ঝুমুর ঝুম। মন্দিরের কাছে একটা পয়েণ্টে সব জড়ো হবে। শেঠ আসবে গাড়িতে সেখান থেকে বাঁকটি কাঁধে নিয়ে দুপা হেঁটে বাবার সেরেস্তায়। দুঘড়া জল হুড়হুড় করে ঢেলে ি লে চমকানো চিৎকার ভোলে বাম, তারক বাম। সারা বছরের বাণিজ্য ছলকে উঠল।

আমাদের বাবা মা দুগ্‌গা, মা কালী! মা আমার মন্দির আলো করে, বাবাকে পায়ের তলায় পেড়ে ফেলে বরাভয় দায়িনী। বছরের শুরুতে ওই মা-ই আমাদের গতি। মায়ের আমার কৃপার শেষ নেই। ওই মাথায় কলি-তীর্থ কালীঘাট আর এমাথায় আমাদের রাসমণির ভবতারিণী। মাঝখানে পিলপিল করছে কয়েক

কোটি পাপীতাপী। কোথাও শান্তি নেই মা। পেটে কিলোচ্ছে, পিঠে কিলোচ্ছে। ঘরে ঘরে গজকচ্ছপের লড়াই। কোথাও বাড়িঅলা দোতলা থেকে মাথার চাঁদিতে গরম ফ্যান ঢালছে। কোথাও ভাড়াটে ভাড়া চাইতে গেলেই কামড়াতে আসছে। কি করা যায় মা। জনতার জলকলে জলের লড়াই। তেলের লাইনে টিনের লড়াই! শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির লড়াই। হাসপাতালে যমে মানুষে নয়, ডাক্তার আর রাজনীতির লড়াই; শ্মশানে মাস্তান আর শবদাহ-কারীদের লড়াই। চাকরির জন্যে মরুদ্ধি ধরার লড়াই। মা ভবতারিণী, তোর হাতের খাঁড়ায় কি ধার নেই মা। একটা লণ্ডভণ্ড লাগিয়ে দে মা।

পয়লা তারিখে মায়ের কাছে আর্জি জানাতে শয়ে শয়ে সন্তান এঁকে বেঁকে ছুটছে। কারুর পেটে আলসার কারুর কোমরে বাত। কারুর বাইপাস করা হার্টে আর তেমন পাম্প নেই। মা তো কারুর একার নয়, পাবলিকের মা। সেখানেও লম্বা লাইন। আগের রাতে ইট রেখে আগেভাগে ঢুপসু করে একটি পেন্নাম ঠুকে আসবে সেটি হবার জো নেই।

টেবিল ঘড়িতে অ্যালার্মে দিয়ে রাখো। শেষ রাতে কানের কাছে কাঁসর বাজবে। তুড়ুং করে লাফিয়ে ওঠো। চটজলদি মেরে দাও এক কাপ চা। মায়ের দরবারে খালি পেটেই যাওয়া উচিত; তবে ঊষাকালে সূর্যোদয়ের আগে কয়েক চুমুক চা আগের দিনের অ্যাকাউন্টেই জমা পড়বে। শাস্ত্রকে আমরা অল্প একটু দুমড়েছি। আর সংবিধানই সহস্রবার সংশোধন হয়ে গেল, শাস্ত্রে কি দোষ। এরপর ট্রেন ধরার মতো মায়ের লাইন ধরতে ছোটো। কোন মাকে ধরবো। কালীঘাট না দক্ষিনেশ্বর। দুই মাই-সমান জাগ্রত। ঠিক মতো ধরতে পারলে বছরটা সামলে যাবে।

কে জানতো দাদারও দাদা আছে। যত আগেই যাও তিনশো জনের পেছনে লাইন। আজ্ঞে আমরা যে কাল রাত থেকে লাইন মেরেছি। আমরা হলুম গিয়ে লাইন এক্সপার্ট। আমাদের ঐতিহ্যকে কি সহসা ম্লান করা যায়। আমরা ময়দানে খেলার টিকিটে লাইন দিয়ে লাইন পাকা হয়েছি। রেলের টিকিটে লাইন মেরে দুঁদে হয়েছি। ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ধৈর্য অভ্যাস করেছি। লাইন আমরা ধরতে জানি, লাইন আমরা মারতে জানি।

ভাববেন না, মন্দির আর বিলিতি ব্যাঙ্ক এখন সমান। এফিসিয়েন্সি ক্রমশই বাড়ছে। মন্দির তো এখনও জাতীয়করণ করা হয়নি যে কর্মীরা হেলতে দুলতে আসবেন, গল্প করবেন, খবরের কাগজ পড়বেন, খেলা নিয়ে তর্কো করবেন আর কাস্টমার কাউন্টারে বাঁকা শ্যাম হয়ে ভুরু কোঁচকাবেন। মন্দিরে পুজো হয়

টেলার সিস্টেমে। উপায় কি? পপুলেশান বাড়ছে, প্রবলেম বাড়ছে, ভণ্ডরা কাতারে কাতারে ছুটে আসছে। কতক্ষন তারা চাতালে গড়াগড়ি যাবে! একের পর এক সার সার দাঁড়িয়ে আছে, হাতে পুজোর নৈবেদ্যর চ্যাঙারি। জবাফুলের কান লকলক করছে। তায় আবার ঝুমকো। এক পাঁজা ধূপ চিমনির মতো ধোঁয়া ছাড়ছে। মায়ের দরজার সামনে মানুষের পাঁচিল। হ্যাগা, মাকে যে একবার চোখের দেখা দেখবো, বচ্ছরকার প্রথম দিনে। অতই সোজা। অন্যের চোখে দেখুন। 'আপনি কি মাকে দেখলেন?'

'ওই কোনও রকমে একটু।'

'কি দেখলেন?'

'কপালের ত্রিনয়ন।'

'যাক তাহলে আমারও দর্শন হল।'

দাঁড়াবার কি উপায় আছে। আমরা মানুষ না ষাঁড়। অনবরত গুঁতিয়ে চলেছে। একেবারে মাকো মাকো ব্যাপার। কে একজন জানিয়ে দিলেন, মা নয় নজর রাখুন পকেটের দিকে। বছরের প্রথম দিনেই গড়ের মাঠ না করে দেয়।

রোদ চড়ছে। টাক ফাটছে। ফল শুকোচ্ছে। ধূপ পুড়ে ছাই হচ্ছে। গিন্নির বড় দয়ার শরীর। কত্তার টাকে পাট করা তোয়ালে চাপিয়ে দিচ্ছেন। বেশ ফর্সা মোটাসোটা হাত। বাগবাজারের কিরিকাটা শাঁখা মা জননীর হাতে কাপ হয়ে বসে গেছে। নোয়াতে সেপটিপিন দুলছে। বৈশাখের তরুন রোদে ফিনফিনে চামড়ার অন্তর ফুঁড়ে লাল রঙের আভা গোলাপী মেরেছে

জুতো রাখার জায়গায় তিন চার মন জুতোর তাগাড় তৈরী হয়েছে। কোন বাবুর পাটি কার তলায় খুঁজে নিতে জান বেরিয়ে যাবে। বুদ্ধিমানেরা আবার কাঁধ ব্যাগে চটি ভরে কাঁধেই ঝুলিয়ে রাখেন। অকুতোভয়ে নয়, অকুতোভয়ে 'মা মা' করেন। সারসার মিষ্টি আর ফুলের দোকানে পোঁ পোঁ মাছি উড়ছে। সাদা বাতাসার পিঠে কালো ডেও পিঁপড়ে ড্রিল চালাচ্ছে। মালিক বসে আছেন টাটে, কর্মচারীরা চু-কিত কিত খেলছে বাইরে। ভক্ত দেখলেই তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে—ও দাদা, ও দিদি, ও মা, ও মাসী, ও জামাইবাবু এদিকে এদিকে। ফিরি জুতো।

দিদিমার বয়সী মহিলার হাত ধরে টানাটানি। বৃদ্ধা বলছেন আমোলো দুটো পয়সার জন্যে মুখপোড়ারা করছে দেখো। রসিক ভদ্দরলোক জিজ্ঞেস করছেন, ফিরি জুতোটা কি বটে? এই পয়লা দিনেই জুতো পেটা করবে?

টাটের টাটু আধহাত জিভ কেটে বললেন, বলেন কি স্যার ? জুতো রাখার ফিরি ব্যবস্থা, করেছি। বলুন মাকে 'ক সিকি চড়াবেন' ? পাঁচ সিকে না কুড়ি সিকে ? জবা কি একশো আট ! আরে গদা বাবুর গায়ে গঙ্গার জল ছিটো।

নাট মন্দিরে কালী কীর্তনের দল ধুম গান জুড়েছে—পাবি না ক্ষেপা মায়ের ক্ষাপার মতো না ক্ষেপিয়ে। ওদিকে এক ক্ষেপা ঘণ্টার দড়ি ধরে প্রবল টানে দমকলের ঘন্টি বাজাচ্ছে। ভক্তির আগুন লেগেছে। মা কি আর কালা হয়ে থাকতে পারেন ?

গঙ্গা থেকে ভিজে কাপড়েই ভক্ত সোজা চলে এসেছেন মন্দির চাতালে। মা হা মা হা করে চিৎকার ছাড়ছেন। তারস্বরে মন্ত্র পড়ছেন সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে। মন্দিরে মায়ের ঘরে চারজন সেবায়েত গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পুজোর কুচকাওয়াজ চলেছে। চ্যাঙারি ডানদিক দিয়ে ঢুকছে হাতে হাতে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে মায়ের পায়ে, হাফ হয়ে ফিরে আসছে বাঁদিক ঘুরে ভক্তের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে অর্ধচন্দ্র খেয়ে তিনি সিঁড়ি বেয়ে হড়হড়িয়ে নেমে আসছেন চাতালে। ব্যাবসায়ীদের বগলে নতুন খেরোর খাতা বুকে মাটির গনেশ। ভুঁড়িটি ফুলিয়ে বুকপকেটের কাছে শুঁড় ঝুলিয়ে রেখেছেন। খাতার পুজোয় সারা বছরের কামাই ভালো হবারই কথা। মা জগদম্বার কাছে এসেছেন বাবা গনেশ। ঠোঁটকাটা জিজ্ঞেস করছে, হ্যাঁ মশায়, এটা আপনার এক নম্বর খাতা না দু নম্বর ! ভদ্রলোক মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। রাগা চলবে আজকের দিনে খিস্তি চলবে না। আজ যা করবে সারা বছর তাই করতে হবে।

ওদিকে জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে প্রেমিক হংস হংসী। গঙ্গার ফুরু বাতাসে ভাবের ঢেউ ছলকে উঠছে। এসব দৃশ্য আজকাল দেখেও দেখতে নেই। শুধু মনে মনে বলতে হয়—মা, আমার ঘরে প্রেমের তুফান তুলিস না। এ কেষ্টকলি বাইরেই দুলুক।

রাম ভক্তরা ছড়া ছড়া কলা নিয়ে হনুমান সেবায় হামলে পড়েছেন ! এক ব্যাটা বীর হনু যুবতীর কমলা লেবু শাড়ি খামচে ধরেছে। বাঁশীর সুরে তিনি চিৎকার তুলেছেন, জনতা মুফত মজায় তালি বাজাচ্ছে।

চায়ের আটচালায় কেলে কড়ায় টোপর টোপর সিঙ্গাড়া বাদামী হয়ে উঠছে। আরেকটা কড়ায় জিলিপি প্যাঁচ মারছে। ফেলে দেওয়া এঁটো ভাঁড়ের গাদায় ধুমসো কুকুর মড়মড়িয়ে খাবার খুঁজছে। প্রবীণ প্রবীণাকে সোহাগ করে বলছেন গরম জিলিপি আর দুটো নেবে নাকি ? সিঙ্গাড়ার ঝালে নাকে জল এসে গেছে। মধুপক্কি রুমালে নাক মুছতে মুছতে বলছেন, নেবে নাও তবে অম্বল হবে।

ভিখিরিরা সার দিয়ে বসে আছে। নানা সুরে পয়সা সাধছে। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি লেগে যাচ্ছে। এক সধবা ভেঙাচি কেটে এক বিধবাকে বলছে—আ মর ডাইনী নাগী। কাকে এক ভদ্রলোকের পাঞ্জাবির পিঠে চুনকাম করে দিয়েছে। দর্শক বলছেন—বড় শুভ লক্ষণ।

সংসারী মহিলা কাপড়িশ কিনছেন ঠুকে ঠুকে, ঠিং ঠিং মিঠে আওয়াজ। শবঠাকুরের মূর্তি কিনছে একটি মেয়ে। শ্যামলা সধবার হাত মুচড়ে মুচড়ে কাঁচের চুড়ি পরাচ্ছে দোকানী। ঝাঁঝাঁ রোদ কাঁপছে গাছের নবঘন সবুজ পাতায়।

দুহাতে দুটো তরমুজ নিয়ে কর্তা বাড়ি ঢুকছেন। সন্ধের ঝোঁকে গোলাপ জল দিয়ে সরবৎ। দোকানের মাইকে হিন্দি গান। কানের পোকা বের করে ছেড়ে দিচ্ছে। আজ আবার হালখাতা। গয়নার দোকানের আয়নায় আলো ঝলমল। মুদীর দোকানে খাতা খুলে বসে আছে মালিক। তলায় ক্যাশবাক্স। দশ কুড়ি যা পারো জমা দাও। ছোট্ট মিষ্টির বাক্স খুলে খুনখারাপী রঙের রস-কদম্ব গেলো। আমপাতা আর শোলার কদমের মালা দুলছে। চটে বরফের চাঙড়া পুরে কাঠের মুগুর দিয়ে পেটাচ্ছে। চুরচুর শব্দ। মাঠা তোলা দুধের দই। সেই দইয়ের ছ্যাড়াকাটা ঘোল। মাথায় না ঢেলে গলায় ঢালছে। আজ হালখাতা।

কলেজ স্ট্রিটের পাবলিশার পাড়ায় ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন জীবন-রসের রসিক বাঘাবাঘা সাহিত্যিক। পথ পেরোতে মুখোমুখি দেখা। প্রশ্ন, কটা বেরুলো? কে বার করলে! বড় পাবলিশারের ঘরে চাঁদের হাটবাজার। হাতে হাতে ঠাণ্ডা জলের বোতল। ঠোঁটে ঠোঁটে পাইপ। প্রিয় লেখককে ছেঁকে ধরেছে ভক্ত পাঠক। সই চাই। শুভেচ্ছা চাই। আজকাল এইসব খুব হয়েছে। ঠোঙাতেই অটোগ্রাফ মারো। উড়ো উড়ো খবর আসছে! অমুক প্রকাশক আজ একটা রামকৃষ্ণ জীবনী ছেপে প্রকাশ করেছিলেন, পুলিশকে কেতার ভিড় ঠেকাতে সকাল থেকে তিনবার লাঠি চালাতে হয়েছে। তমুক প্রকাশক আর একটা প্রেমের বই ছেপেছিলেন, তিন ঘণ্টায় প্রথম সংস্করণ খামচাখামচি করে নিয়ে গেছে। এইসব শুনে না-বিকনো লেখকদের মুখে কালো ছায়া নামছে। একজন মুখ ভার করে বলছেন, আর ভাই সেই কথা—ধর্ম অর্থ কাম। এপাশে ধর্ম ওপাশে কাম মাঝখানে অর্থ। বুঝলেন না একুলের এই হল স্যাণ্ডউইচ।

আজ আবার স্টুডিও পাড়ায় নতুন বইয়ের মহরত হল। শুক্লা প্রোডাকসানের সত্যবাদী পুলিশ। মৈত্রী, দুর্ধর্ষ সেনাপতি। পরিচালক, চপলা চঞ্চলা।

প্রযোজক, গজেন সাঁতরা। নায়িকা নবাগতা, মিস বেঙ্গল রানার্স আপ, ফুলকলি। স্টোরিতে আজকাল আদর্শ পুলিশ থাকলে পাবলিক খুব খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বই হিট। বক্স অফিস ভেঙ্গে টুকরো। ফ্লোরে নায়িকা প্যাঁজখোসা কাপড় পরে বক্ষ উন্মোচন করে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্ল্যাপস্টিক ঠুকছেন। গজেন সাঁতরার গুরু, জটা বাবা। ফটাফট ছবি তুলছেন। ক্যামেরাম্যান। লেখক দুর্ধর্ষকুমার পাকাপাকা কথা বলছেন। চিত্র সাংবাদিকের প্রশ্ন—গল্পটা মারা না ওরিজিন্যাল। চপলা চঞ্চলার জাত আর সেক্স কোনওটাই বোঝা যাচ্ছে না। বেশ টেনেছেন, তেমনি ঘেমেছেন, তবে অ্যাম্বিশান সাংঘাতিক। এই প্রথম বইতেই তিনি বেরিয়ে আসবেন ককটেল হয়ে। সত্যজিৎ, মৃণাল, তপন, তরুণের পাশ। বাংলা ছবির জগতের শেষ কথা।

একটু বেশি রাতে, কর্তা লেটকে পড়েছেন চৌপায়ায়। বছরের প্রথম দিনটি খসে গেল। এইবার তার পোস্টমর্টেম। আগে ছিল পুজোয় নতুন জামা কাপড়, এখন নববর্ষেও সেই সখ্যেনেশে রেওয়াজ চালু হয়েছে। কর্তা গুনগুন করছেন—হাসিমুখে ফাঁসি বরণ করছে বিপ্লবী ভ্যাদারাম। মা ষষ্ঠীর কৃপায় এ পুরুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। দেয়ালে যৌথ পরিবারের পরলোকগত যারা তাঁরা ছবি হয়ে ঝুলছেন। দেবদেবী আর তাঁরা সব মিলিয়ে গোটা চব্বিশ রজনীগন্ধার মালা পড়েছেন। বড়য়, ছোটয় মিলিয়ে গড়ে প্রতি মালা পাঁচ। মেরে দিয়ে গেছে রে বাপ।

pathagar.net

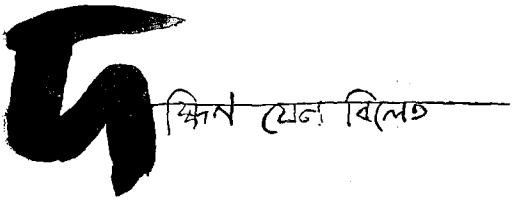

বড় অপদস্থ হয়ে ফিরে এলুম। বিলেত থেকে নয়, আমাদেরই এই কলকাতার দক্ষিণাঞ্চল থেকে। উত্তর কলকাতার ছেলে। কে জানত ছাই, চুলে তেল মাখা একটা মস্ত বড় অপরাধ। নুইসেন্‌স। আমাদের উত্তরাঞ্চলের সাবেক প্রথা, মাথার ব্রহ্মতালুতে নারকোল তেল থাবড়ে, সর্বাঙ্গে সরষের তেলের প্রলেপ মেরে নিত্য স্নান। তা তেল চুকচুকে ফুলেল বাবুটি হয়ে আমার এক সহপাঠীর বাড়িতে প্রথম গেছি। খোদ বালিগঞ্জে তাদের বাড়ি। গরম কাল। বেশ ঘেমেছি। ঝুলপির পাশ দিয়ে তেল চুকচুকে একটু ঘামও নেমেছে। মুখটাও মনে হয় চক চক করছে।

যাই হোক বাইরের ঘরের সোফায় স্থান হল। প্রথম গেছি! একটু আড়ষ্ট ভাব। একে একে পরিবারের সকলে এলেন। আমার সেই বন্ধুর মা, তার বোন, ছোট ভাই। বাবাও একবার এসে উঁকি দিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলুম, আমাকে সবাই দেখছেন। অনেকে আবার এসে এসে দেখে যাচ্ছেন। ছোট বড় সবাই। আমি একানে একটা সোফায় আমাদের কলকাতার চিড়িয়াখানার মোহনের মতো বসে আছি। মোহন সেই সময় খুব বিখ্যাত হয়েছিল। শিমপাঞ্জি মোহন। শুধু দেখা নয়, মুচকি মুচকি হাসছেনও।

ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতেও পারছি না।

শেষে আমার বন্ধু বললে, 'তুই চুলে অত তেল মেখেছিস কেন! যাত্রার দলের অধিকারীদের মতো। পাতা কেটে চুল আঁচড়েছিস। গোলাপফুল আঁকা একটা টিনের সুটকেস নিয়ে সাইকেল রিকশায় চেপে কোলে একটা টোপর, যেন নসীপুরের গোপাল বিয়ে করতে চলেছে।' খিল খিল হাসি। সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের সামনে আমার সে কি করুণ অবস্থা। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা একবার মুছে নেব, সে সুযোগও আর রইল না।

সেই প্রথম আমার শিক্ষা হল চুলে তেল মাখলেই দক্ষিণের কেতায় তুমি ব্রাত্য। তুমি হরিজন। উত্তরের চুল আর দক্ষিণের চুলে অনেক ফারাক। উত্তরের মেয়েরা সাবেক প্রথায় বিশ্বাসী! চুলে তেল তো দিতেই হবে। নিয়মিত আঁচড়াতে হবে, টান টান করে বাঁধতে হবে। দক্ষিণের কি ছেলে কি মেয়ে, গোঁফের আমি গোঁফের তুমি নয়, চুল দিয়ে যায় চেনা। দক্ষিণের কালচার হল শ্যাম্পু-কালচার। এক মাথা কটা কটা চুল বাতাসে উড়বে। ঝোড়ো কাকের মতো হয়ে যাবে। তেলের অভাবে ঊর্ধ্ববায়ু রোগ হলেও ফ্যাশানের সঙ্গে কম্প্রোমাইস করা যাবে না। মাথা আগুন। ফাঁকে ফাঁকে খুসকি। পেকে যাক, পড়ে যাক, টাক পড়ে যাক সেও ভি আচ্ছা, চুলে তৈল নাস্তি। উত্তরের প্রবীণা দক্ষিণের নবীনাকে কাছে পেলে আদর করে বলবেন, 'মা চুলে একটু তেল দিস না কেন? জটে বুড়ি, পাগলি পাগলি চেহারা করে রেখেছি।'

দক্ষিণ কলকাতাই প্রথম সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, পেছন দিক থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই কে ছেলে আর কে মেয়ে। উত্তরের বনেদী মানুষ ট্রাম থেকে নামবেন। বললেন, 'দেখি মা আমাকে একটু যেতে দাও।' হেঁড়ে গলায় উত্তর, 'যান না। ঠেলে চলে যান।' বৃদ্ধ নামতে নামতে বললেন, 'বাবা এ যে দেখি পরশুরামের লালিমা পাল, পুং।' উত্তর কলকাতায় স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ সহজে আলাদা করা যায়। উত্তরে ছেলেরা মেয়েদের মতো সুললিত চারুকারু-কলার মতো, ফিনফিনে, মিনমিনে হলে খুব একটা গৌরবের হবে না। সকলেই এক বাক্যে বলবেন, মেনিমুখো, এফিমিনেট। আবার মেয়েরা ছেলেদের মতো লাজ লজ্জাহীন, মুখরা, চোটপাট, পায়ে পড়া হলে, উত্তরের মানুষ বলবেন, দজ্জাল। ছেলে ছেলে ভাব।

দক্ষিণ যত দ্রুত বিলেত হতে পেরেছে, উত্তর পারেনি। এখনও পারেনি। পারবেও না। প্রোটেস্টান্ট আর ক্যাথলিকদের মতো উত্তর কলকাতার কালচারাল প্রোটেস্টান্টরা দক্ষিণে মাইগ্রেট করেছেন। দক্ষিণের অহঙ্কার হল কলকাতা

বলতে দক্ষিণকেই বোঝায়। এক সময় কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত হবার জন্যে গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায় খুব বোল্ড হয়ে উঠেছিলেন। জীবনের এমন সব কথা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন যাকে বলা চলে এক ধরনের দুঃসাহস। অনেক বাধা, বিধি-নিষেধ তাঁরা ফেলে দিয়েছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় একটা 'ফেলা কালচার' শুরু হয়। প্রথমে মেয়েরা চুল ফেলে দিলেন। সত্যিই বুকের পাটা আছে বলতে হবে। কত সাধনায় চুল বাড়ে। সেই-চুল প্রথমে হল ডগা ছাঁটা, তারপর হল 'বব', শেষে বয়কাট। উত্তরের মেয়েদের অত দুঃসাহস নেই। এখনও চুলের মোহে মোহগ্রস্ত। সামান্য এক বিঘত চুল ফেলতে তাদের দ্বিধা যেন সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ত্যাগের দ্বিধার মতো।

তার পরের ফেলায় কোপ পড়ল মেয়েদের জামায়। কাঁধ থেকে ব্লাউজের হাতা অ্যামপুট। কোমরের দিক থেকে চলে গেল এক রাউন্ড। শ্রী আর শ্রীমতী দুজনেই স্যাণ্ডো। উত্তরবাসী ব্যঙ্গ করলেন, 'ইঞ্জেকসান' হাতা। দুটি প্রাণীর সুবিধে হল, কম্পাউণ্ডার আর মশা। ধরো আর ফোটাও। রোল ইওর স্লিভস বলতে হবে না।

উত্তর কলকাতার যুবকদের চেয়ে দক্ষিণের যুবকরা অনেক সুখী। অনেক বেশি শরীর ও রূপ-সচেতন। নারসিসিস্ট বলব কি না ভাবছি। কলকাতার ওই তল্লাটে 'বিউটি স্লিপ' বলে একটি প্রথার প্রচলন আছে। দুপুরে আহারাদির পর ছোট্ট একটি ঘুম। ঘুম থেকে ওঠার আগে মাথাটা খাট বা ডিভান থেকে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে রাখা। উদ্দেশ্য চোখ মুখ একটু ফোলা ফোলা তপতপে করে তোলা। কারণ দক্ষিণে প্রেম একটু বেশি। রাতে যেমন চৌকিদার রোঁদে বেরোয় সেই রকম যুবকরা বিকেলে মেলামেশায় বেরোয়। লেক আছে, পার্ক আছে, গড়িয়াহাটের মোড় আছে দক্ষিণের ছেলেরাও সাজতে জানে। মুখে পাউডার তো মাখেই। ঠোঁটে হাল্কা করে লিপস্টিক মাখলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। উত্তমকুমার মাখতেন। সেই তুলনায় উত্তরের ছেলেরা চাষা।

জামা-কাপড়েও দক্ষিণের একটা নিজস্ব ব্যাপার আছে। সাধারণ কাপড়ে জামা প্যাণ্ট তৈরি তো সবাই করে। দক্ষিণের উদ্ভাবনী শক্তি অনেক বেশি। পর্দা কেটে পাঞ্জাবি। লুঙি কেটে বুশ শার্ট। চট কেটে ফুলপ্যাণ্ট। যে যত উদ্ভট সাজ-পোশাক করতে পারবে সে তত বেশি ইণ্টেলেকচুয়াল! দক্ষিণ কলকাতায় গামছা একটা নিষিদ্ধ আইটেম। ব্যবহারের তালিকায় গামছা, খাদ্যের তালিকায় পোস্ত, মুড়ি বাতিল। তোয়ালে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু বাঁদিপোতার গামছা কেটে পাঞ্জাবি করলে হই হই পড়ে যাবে। ফুলপ্যাণ্টের

সঙ্গে পাঞ্জাবি পরার ফ্যাশান সাউথ থেকেই মনে হয় এসেছে। ফুল প্যান্টের সঙ্গে ফিতে বাঁধা শু পরলে সবাই ছি ছি করবে গ্রাম্য বলে। পরতে হবে স্লিপার। কিন্তু প্যান্ট-পাঞ্জাবি কম্বিনেশানের সঙ্গে স্পোর্টস শু চলতে পারে। তাঁতের শাড়ি আর হ্যান্ডলুমের জামার কাপড় হল দক্ষিণী কালচারের অঙ্গ। সিন্থেটিক শাড়ি, বিশেষ করে পলিয়েস্টার প্রায় অচল। জামার তলায় গেঞ্জি পরার প্রথা উঠে যাচ্ছে। পাঞ্জাবির বুকের বোতাম লাগানো গ্রাম্যতার লক্ষণ। দক্ষিণী স্টাইলের পাঞ্জাবিতে বোতাম ঘর না রাখাটাই ফ্যাশান। জামার তলা থেকে লোমওলা বুক অল্প একটু উঁকি মারবে।

উত্তরবাসীদের শোবার কোনও নির্দিষ্ট পোশাক নেই। যা হয় একটা কিছু পরে শুলেই হল দক্ষিণবাসীদের চাই স্লিপিং স্যুট। সব ব্যাপারেই একটু নায়ক নায়ক, উত্তমকুমার উত্তমকুমার ভাব আছে। চান করে একটা বাথস্যুটের বা তোয়ালে গাউনের কোমরের দড়িতে ফাঁস বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে আসার দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়বে। উত্তর কলকাতার স্নানের দৃশ্য বেশ অশালীন। তোয়ালে বা গাউন এখনও ঢোকেনি। তোয়ালের চেয়ে গামছা অনেক ভালো বেশি হাইজিনিক। এই রকম একটা ধারণা উত্তরবাসীর মধ্যে প্রচলিত আছে। সেই গামছা পরে উদোম হয়ে স্নান করায় বেশ একটা তৃপ্তি খুঁজে পায় উত্তরতলির মানুষ। উত্তরের মানুষের লজ্জাশরম একটু কম। তেমন কেতাদুরস্ত নয়।

ডাইনিং টেবিলের চল দক্ষিণেই হয়েছে আগে। উত্তরে এঁটোকাটার বিচার একটু বেশি। মাটিতে থেবড়ে বসে যতটা জমিয়ে খাওয়া যায়, ডাইনিং টেবিলে ঠিক তেমন হয় না। এই সেদিন পর্যন্ত উত্তরের ঘরে ঘরে কাঁসার থালা, ঘটি, বাটি, গেলাসেরই চল ছিল বেশি। ইদানিং স্টেনলেস ঢুকে পড়েছে, কিন্তু পোরসিলেন খুবই কম। উত্তরের খাবার বেড়ে দেওয়া হয়। দক্ষিণে খেতে খেতে বাঁ-হাতে তুলে নিতে হয়। এই প্রথায় অপচয় কম হয় ঠিকই কিন্তু ঘাঁটা চটকা ঠেকাঠেকির একটা ব্যাপার থেকে যায় যা উত্তরের গৃহিণীরা অপছন্দ করেন। স্ট্যাটিসটিকস নিলে দেখা যাবে উত্তরের সংসার এখনও তেমন ফ্রিজনির্ভর হতে পারেনি। তারা টাটকা খাবারে বিশ্বাসী। ফ্রিজ থেকে ঠ্যাং বেরোবে। বরফ কঠিন মাছের মৃতদেহ বেরোবে, তিন দিন আগে রান্না ডাল তরকারি বেরোবে, উত্তরবাসীর সেটা পছন্দ নয়। উত্তরের মানুষ রোজ বাজার করবে, দক্ষিণের মানুষ তিনদিনে একদিন।

উত্তর কলকাতার মানুষ আঙুলের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, দক্ষিণের মানুষ চামচে নির্ভর। চামচে দিয়ে সিঙ্গাড়া খেতে গিয়ে খোল নলচে আলাদা হয়ে যায়।

খোল একদিকে পুর আর এক দিকে। ছুরি কাঁটা দিয়ে চারাপোনার ডিসেকসান। উত্তরের পাকা সার্জেনেরও সাধ্যে কুলোবে না। দক্ষিণের ট্রেনিংটাই আলাদা! সকালবেলা গলার টাগরায় ডান হাতের তিনটে আঙুল পুরে অ-অ শব্দে জিভ হোলা, ফচাত ফচাত কুলকুচো। দানবীয় পুরুষালি ভাব। দক্ষিণের মানুষ দাঁত মাজার বুরুশ ধরেন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি ধরার কায়দায়। কেতাবী ক্রিকেটের মতো দাঁতে ব্রাশ চালান কেতাবী কায়দায়। নিচে থেকে ওপর। ওপর থেকে নিচে। কষের দাঁতে বৃত্তাকার ছন্দ। উত্তরের ঘেসর ঘেসর নয়। উত্তরের মানুষ দাঁত মাজছে না বাসন মাজছে ছাই আর শালপাতা দিয়ে বোঝা মুশকিল। উত্তর একটু লাউড। দক্ষিণ একটু সফ্‌ট। জীবনের সব ব্যাপারেই বেশ একটা পালিশ আছে যাকে ইংরেজিতে বলা চলে ফিনিশ। সেই কারণে উত্তরের সংসার যেন সময় সময় ফেটে পড়ে। ঝগড়া-ঝাঁটির সময় শিক্ষা-দীক্ষার সব বাঁধন-টাঁধন খুলে পড়ে যায়। সেখানে যা কিছু ঘটে সব সিনসিয়ার অ্যান্ড অরিজিন্যাল। দক্ষিণের সব ব্যাপারে একটা দক্ষিণী মোড়ক থাকে। উত্তরের কেউ রেগে গেলে, ঝট করে সরোষে বলে ফেলবে, মারবো জুতো। দক্ষিণ সেই একই কথা বলবে মোলায়েম করে। মৃদু সুরে। বলবে, 'আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি। লুজিং টেম্পার। পা থেকে জুতোটা খুলে তোমার গাল দুটোয় এক রাউন্ড লেদার মাসাজিং করে দিলে খুব অন্যায় হবে কি? এক্সকিউজ মি, তুমি একটা জেনুইন শূকর শাবক।' সাউথ যা কিছু ছাড়ে বেশ ফিনিশ করে ছাড়ে। দক্ষিণের স্বামী যদি স্ত্রীকে ধরে পেটাতে চান, তাহলে স্ত্রীকে বলবেন, 'এক্সকিউজ মি। তুমি কাইন্ডলি একটু বেডরুমে এসো। হ্যাঁ, এবার পর্দাগুলো টেনে দাও! নাও, গেট রেডি। মুখে একটা মাফলার জড়াও। ইট ইজ বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি। সিলি সোয়াইন।' এক চড়। দক্ষিণের জীবন খুব মাপা। ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট ধস্তাধস্তি। টি, এস, ইলিয়ট সায়েবের কথায়, 'কফি স্পুনস'-এর জীবন। আই হ্যাভ মোজারড আউট মাই লাইফ উইথ কফি স্পুনস। এরপর কর্তা রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা আবৃত্তি করতে লাগলেন। গিন্নি বসে গেলেন হারমোনিয়াম নিয়ে। অল্প অল্প কান্না জড়ানো গলায় গাইতে লাগলেন—এই কথাটি মনে রেখো, আমি যে গান গেয়েছিলেম। দক্ষিণের বধূ হত্যা বিছানায় জড়ানো থাকে খাটের তলায়। পুলিস এসে দেখতে পায়, ঘরে পারিবারিক ভোজ-সভা চলেছে, কি সাইভজন হচ্ছে। উত্তরে এখনও কালীঘাটের পটের জীবন চলেছে। চুলির মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল দাওয়া থেকে ঘরে। চিৎকার, চেঁচামেচি। লোক জড়ো হয়ে গেল। দক্ষিণের মানুষ খাঁদা। কেউ

কারুর ব্যাপারে নাক গলায় না। যে যার সে তার। উত্তরে তা নয়। উত্তরের জীবনে পরচর্চা এখনও একটা রিয়েল চার্ম। কলকাতা দূরদর্শনের এক পরিচালক বলেছিলেন ভারী সুন্দর কথা, দক্ষিণের মেয়েদের কোনটা যে কথা আর কোনটা যে কথার কথা বোঝা দায়।

উত্তর কলকাতার ঘর-সংসার এখনও এলোমেলো। ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন নিয়ে তেমন মাথা-ব্যাথা নেই। যা হয় একটা হলেই হল। জিনিসপত্র যেভাবে হোক রাখলেই হল। খুব ফাংশানাল। ফ্রি ফল অল। ঘর অনুযায়ী ফার্নিচার, অথবা স্পেস প্ল্যানিং-এর কোনও ব্যাপার নেই। খাটের ছত্রি থেকে গামছা ঝুলে আছে। চেয়ারের ওপর ডাঁই করা জামাকাপড়। টেবিলের ওপর এলোমেলো বই। ঘরের কোনে পুরনো কাগজের তাগাড়। খাটের তলায় ভাঙা কাঠকুটো। ঘুঁটে কয়লা কেরোসিন বেরলেও আপত্তির কিছু নেই। ঢাউস একটা কি দুটো স্টিল আলমারীর সিকিউরিটি নিয়ে সংসার। সব ফ্যামিলিতেই আলো বাতাস বন্ধ করে খাড়া জগদ্দল। দক্ষিণে বসবাসের মহা হ্যাঁপা। জানলায় জানলায় পেলমেট চাই। সার সার পর্দা চাই। ঘরের দেয়ালের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বিছানার চাদর, পর্দা, এটা ওটার ঢাকা। বসার ঘরে এক টুকরো কার্পেট চাই। আজকাল আবার একটা রবার গাছ চাই। রোজ সকালে ছোট ছেলেকে যেমন মা চান করান সেই রকম রোজ সকালে রবার গাছের পাতা বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে, তেল জল দিয়ে চুকচুকে করে দিতে হবে। তাছাড়া সারা ঘরে আরও অনেক হুজ্জোত ছড়ানো থাকবে। দক্ষিণের মানুষ কারুশিল্পের ভক্ত। দেয়ালে মাদুর। দরজার পর্দার টিংলিং ঘণ্টা। ও দেয়ালে মুখোশ। সে দেয়ালে একটা পেতলের থালা। বাইরের ক্যাবিনেটের ওপর মনসার ঝাড়। কোণের দিকে বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার গলা উঁচু পোড়া মাটির ঘোড়া। সোফায় গোল ঢাকা, চৌকো চার কোনা পিঠ-বালিশ। নানা ঝঞ্ঝাট নিয়ে উস্তমখুস্তম অবস্থা। ঝুল আর ধুলোর সঙ্গে নিত্য লড়াই। এরপর লাল নীল মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম হল গোদের ওপর বিষফোড়া। আজকাল আবার এক রকমের লোমঅলা কুকুর বেরিয়েছে। ঘরে ঘরে ওই কুকুরের সংখ্যা বাড়ছে। লোমের পরিচর্যায় দিন কাবার।

বাংলা বর্ণমালায় তিনটে স আছে। শ, ষ, স। দক্ষিণ সব স-কেই তালব্য শ করে ফেলেছে। নাটকে নায়িকা নায়ককে বলছে, শ্যোনো শ্যোমেন তুমি শ্যোমার শ্যঙ্গে শুখে থাকো আমি শ্যোলদা থেকে ট্রেন ধরে শ্যামনগর চলে যেতে পারবো 'দক্ষিন কলকাতার বাঙলা উচ্চারণের বেশ একটা মজা আছে।

ড়-এর উচ্চারণই বেশি। যেমন আমড়া কড়েছি আমাদেড় কাজ। তোমড়া কড়ো তোমাদেড়। দক্ষিণ কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব উত্তরের চেয়ে অনেক বেশি। জোড়াসাঁকোর দুধারে এখন যাত্রাপাড়ার দাপাদাপি। উত্তর এখনও ওই। সতীর কোলে পতির পুণ্য, সিঁদুর দিও না মুছে, এই সব নিয়েই মেতে আছে। উত্তরের সংস্কৃতি ভোলাময়রা, গিরিশচন্দ্র অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ীতেই প্রাণ পায়। খেয়াল, টপ-ঠুংরি, টপ্পা, খেমটার সঙ্গে বেশি একাত্ম হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ উত্তরের মানুষ হয়েও আসন পেতেছেন দক্ষিণে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার যত ভালো প্রতিষ্ঠান সব দক্ষিণে। আর রবীন্দ্রসদন ও অ্যাকাডেমি পড়ে আছে নর্থ সাউথ গ্রেট ডিভাইডের ওপর। রবীন্দ্র প্রভাবে দক্ষিণের বাচনভঙ্গি একটা স্বতন্ত্র ঘরানা পেয়েছে। এক সময় পাজামা, গেরুয়া পাঞ্জাবি আর ঝোলা ব্যাগ ছিল সাউথের জার্সি। এখন হয়েছে জিনিস। যার ভেতরের ফ্ল্যাপে ছোট ছোট করে লেখা আছে ডোন্ট ওয়াশ, সিম্পলি ব্রাশ।

সাউথের ট্যাক্সি চাপা দিয়ে তরজার দরজা বন্ধ করি। ট্যাক্সির চালক বললেন, 'সাউথের ট্যাক্সি চাপা কি রকম জানেন। খুকু চাপা। একটি ছেলে একটি মেয়ে। ট্যাকসি-ই। এই ট্যাক্সি। আপনারা উত্তরের লোকেরা ওভাবে ডাকতেই পারবেন না? এর পরে, যাবে কত দূর জানেন? এ মোড় থেকে ও মোড়।'

স্ট্র্যান্ড রোডের অফিস থেকে দুই বন্ধু বেরোলেন। দুজনেরই বাড়ি সাউথে। ট্যাক্সি ধরলেন। গাড়ি চলেছে। দুজনেরই চোখ মিটারে। কালীঘাট যেই পেরিয়েছে দুজনেই এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, স্টপ, স্টপ। ড্রাইভার চমকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক। বাড়ি তখনও মাইল দুই দূরে। বাকি পথটুকু হেঁটে। একে বলে হিসেবীর ট্যাক্সি চাপা। পনের টাকা যাবো, কি কুড়ি টাকা যাবো, সেটা ঠিক করে গাড়িতে ওঠা। পুরো পথের কথা ভাবার দরকার নেই।

উত্তর চিরকাল বেহিসেবী। সেই বাবু কালচারের ট্রাডিশান। খেয়ে, খাইয়ে, উড়িয়ে পুড়িয়ে ফাঁক। চালাও পানসি বেলঘোরিয়া। দক্ষিণের জীবনে ফিনিশ আছে, পালিশ আছে, ফিনফিনে ভাব আছে। চুলে শ্যাম্পু, মুখে পাউডার পাফের হাল্কা পোঁচ, গায়ে সেন্ট। কায়দার কথা; কিন্তু বড় হিসেবী। মেলামেশায় কেতাবী ভদ্রতা। কিপলিং-এর অনুকরণে বলা যায় নর্থ ইজ নর্থ, সাউথ ইজ সাউথ, কানেকটেড বাই আন্ডার গ্রাউন্ড রেল। পুজোর সময় উত্তর এসে গড়িয়াহাট লুটেপুটে নিয়ে যাবে। উত্তরের মানুষ এখনও ওড়ে বেশি। বাসা না থাক ডানা আছে। দক্ষিণ বসে আছে দাঁড়ে, কাকাতুয়া হয়ে। তবে

একটা জিনিস লক্ষ করছি, উত্তরের মানুষের একটু নাম হলেই তাঁরা দক্ষিণে উঠে যাচ্ছেন। দক্ষিণ যেন কলকাতার বিলেত। কত ফ্রিডম, কত ফেসিলিটি!

যত সুখ সাউথে, বলে যাঁরা ওই তল্লাটে গিয়ে বসবাস শুরু করেছেন বা জাতে উঠেছেন তাঁরা জানেন উত্তরের জীবনের ঘন বুনোন ওখানে নেই। এর বাড়ির মোচার তরকারির সঙ্গে ওর বাড়ির বড়ির ঝালের আদান-প্রদান হয় না। একটা গল্পের মতো সত্য ঘটনা বলি। দক্ষিণে বড় বড় চাঁই অফিসারদের জন্যে সুদৃশ্য ফ্ল্যাট আছে। আমার পরিচিত শ্রী সেনগুপ্ত অসুস্থ শুনে দেখতে গেছি। পাশাপাশি অনেক ফ্ল্যাট। খুঁজে খুঁজে শ্রী সেনগুপ্তর ব্লকটি পেলুম। সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায়। ডানপাশে একটি ফ্ল্যাট বাঁ পাশে একটি ফ্ল্যাট। সেনগুপ্ত থাকেন বাঁয়ে। আমি ভুল করে ডানদিকের কলিংবেলের বোতাম টিপলুম। উগ্র চেহারার এক ভদ্রলোক দরজা খুলে ছিটে গুলির মতো প্রশ্ন ছুঁড়লেন—'হুম ডু ইউ ওয়াণ্ট।' পরনে মানিক পীরের মতো ড্রেসিং গাউন। থতমত খেলেও বিশুদ্ধ বাঙলায় জিজ্ঞেস করলুম, 'মিস্টার সেনগুপ্ত আছেন?'

'হু ইজ মিস্টার সেনগুপ্ত?'

আমি পুরো নাম ও তাঁর পরিচয় দিলাম। ভদ্রলোক বললেন, 'সরি, আই কাণ্ট টেল। সপাটে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি উল্টো দিকের দেয়ালে শ্রী সেনগুপ্তর নেম প্লেট। এপাশে গাঙ্গুলী ওপাশে সেনগুপ্ত। সেনগুপ্তকে বললুম, 'কি আশ্চর্য, মিস্টার গাঙ্গুলী আপনাকে চেনেন না?

মিস্টার সেনগুপ্ত চিবিয়ে চিবিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'হু ইজ গাঙ্গুলী?'

এই হ'ল দক্ষিণ।

pathagar.net

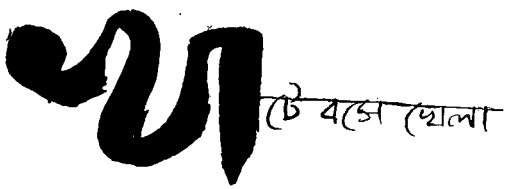

আমি এত বড় একজন বিশেষজ্ঞ হলাম কি করে, এ প্রশ্ন যদি কেউ করেন তাহলে বলব, আমার সাধনভূমি হল খাট আর উপকরণ হল গোটা চারেক বালিশ আর হাত চারেক তফাতে একটা টিভি। মাঠ নয়, ময়দান নয়, দূরত্ব কোনও প্র্যাক্টিস সিডিউল নয়, ব্রেক আড় হয়ে শুয়ে শুয়ে, দু চোখ খোলা রেখে, আমি ফুটবলার, ক্রিকেটার, টেনিস চ্যাম্পিয়ান। হকি, ব্যাডমিণ্টন কোনও খেলাই আর আমার অনায়ত্ত নয়। এমন কি বিশ্বের সেরা জিমন্যাস্ট। অবশ্য জিমন্যাস্ট হবার জন্যে প্রতিদিন আমাকে কড়া একটা প্র্যাক্টিস সিডিউল অনুসরণ করতে হয়। পি টি উষা কি মহম্মদ আলির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এ আমাকে প্রাণের দায়ে করতে হয়। আমার ভাত-ভিক্ষা। না করলে হাঁড়ি চড়বে না। আসলে আমি একজন জিমন্যাস্ট। আর যে কোনও একটা দিকে প্রতিভার উন্মেষ হলেই তার সব আয়ত্তে এসে যায় একে একে। যেমন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সায়েব সেতার-সরোদ এসরাজ, মায় সব তারের যন্ত্র বাজাতে পারতেন, আবার গানও গাইতে পারতেন। প্রতিভা হল কর্পোরেশনের পাইপ-ফাটা জলের মতো। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ভাসিয়ে মহাজাতি সদনের পাশ দিয়ে কলাবাগান বস্তি ভেদ করে ঠনঠনিয়ায় মায়ের পায়ে আছড়ে পড়ে।

আমি জিমন্যাস্ট হতে চাইনি। যেমন চোরেরা থানা অফিসারকে বলে, হাজোর আমি চোর হতে চাইনি। যেমন মাতাল, স্ত্রীর ঝ্যাঁটা পেটা খেতে খেতে বলে, মাইরি বলছি আমি ছুঁতে চাইনি, সাধনটা জোর করে খাইয়ে দিলে। আমি যে রাজ্যের ভোটার, র‍্যাশানকার্ড হোল্ডার, মানুষ আর বলব না, কারণ আমি, যাদের মানুষ বলে, অন্যান্য দেশে যাদের মানুষ বলা হয়, আমি সে দলে পড়ি না। আমার রাজ্যে গত স্বাধীনতার পর থেকে, গত বলছি এই কারণে স্বাধীনতা মারা গেছে। এখন আমরা আর শৃঙ্খলমুক্ত নই শৃঙ্খলামুক্ত অর্থাৎ বিশৃঙ্খল, তা সেই স্বাধীনতার পর থেকে এ রাজ্যে সর্ব-ব্যাপক-অ্যাথলিট-তৈরি-প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এমন কায়দায় করা হয়েছে, কারুর বোঝার উপায় নেই। সকাল বিকেল ট্রেনিং হয়ে যাচ্ছে। ছেলে, বুড়ো, মেয়েমদ্দ কেউ বাদ পড়েনি। এই ট্রেনিং-এর যিনি ডিরেক্টার তাঁর মত কোচ পৃথিবীতে আর দুটি নেই। তিনি অদৃশ্য, অথচ ট্রেনিং পুরোদমে চলছে। নিজেরাই নিজেদের ট্রেনিং দিচ্ছে। ইংরেজি করলে দাঁড়ায়, সেলফ-প্রপেলড ট্রেনিং কোর্স। কবীর সাহেব গান লিখেছিলেন, যার ভাবটা ছিল এইরকম, আকাশ আর ভূমি দুটো বিশাল চাকি, সেই দুই চাকির মাঝখানে মানুষ যেন গমের দানা, অহরহ পেষাই হয়ে চলেছে। অদৃশ্য চাকির মতো, প্রচ্ছন্ন প্রশিক্ষণ প্রকল্প। কেউ জানাল না, কেউ বুঝল না, অ্যাথলিট হয়ে গেল, জিমন্যাস্ট হয়ে গেল। সকালবেলা অফিস যেতে হবে, ব্যবসায় বেরোতে হবে। জীবিকার সন্ধানে সুস্থ সমর্থ মানুষকে বেরোতে হবে। বাস, ট্রাম, ট্রেন ধরতেই হবে। না ধরে উপায় নেই। উপোস করে মরতে হবে। পৃথিবীর সব সভ্য দেশে কি হয়! ঝকঝকে, তকতকে একটা বাস স্টপেজে এসে দাঁড়ায়। মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। টুক্, টুক্ করে এক একজন উঠে পড়ে। বাস ছেড়ে দেয়। আমাদের সিসটেম অন্যরকম। অনেকে মনে করেন, এ আবার কি! এর আবার কি মানে! আমরা অ্যাথলিট চাই। স্বামী অ্যাথলিট, স্ত্রী অ্যাথলিট, ছাত্র, শিক্ষক, বড়বাবু, ছোটবাবু, জামাইবাবু, কামাইবাবু, হেঁপো রুগী, বেতো রুগী, ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান, হবে জিমন্যাস্ট। সেই কারণে, আমাদের দৃশ্যটা হয় এইরকমঃ বাস আসছে। বাস আসছে না তাল তাল মানুষ আসছে বোঝার উপায় নেই। ইঁদুর ধরা কলের মতো। এদিকে ঝুলছে, ওদিকে ঝুলছে। এদিকে মাথা, ওদিকে পা। ন্যাল ব্যাল, ঝ্যাল ঝ্যাল বাঙালী। পাঁঠার দোকানের রেওয়াজী মালের মতো। আর কি! সামনের আর পেছনের গেটে দুই ওস্তাদ হাতল ধরে জানলার রড ধরে, কখনো ঝুলে, হাত তুলে, পা তুলে, ডিগবাজি খেয়ে, চিৎকার করে, আশপাশের লোকের পিলে চমকে দিয়ে

কর্পোরেশনের কুকুর ধরা গাড়ির মতো, কি একটা সামনে এসে হ্যাঁচকা মেরে থামল! অনেকের সঙ্গে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। এই সময় আমি, টেনিস আর ফুটবল দুটোকে এক সঙ্গে পাশ করে টেনিফুটুস খেলি। সেটা কি! ওই খাট আর টিভি চাই। এ খেলার কোনও গ্রামার নেই। কোনও কোচ নেই। খাটে বসে, টিভি দেখে শিখতে হয়।

নাদ্রোতিলোভার খেলা দেখতে হবে। এ পাশে তিলোভা, ওপাশে মার্টিনা। মার্টিন সার্ভিস করছেন। তিলোভা এপাশে কি করছেন? ভালভাবে লক্ষ্য করুন। তিলোভা সামনে ঝুঁকে পড়েছেন। পেছনটা দুলছে। কিভাবে দুলছে! দুটো বাচ্চা বেড়াল যখন খেলা করে তখন একটা আর একটার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে পেছনটা যেভাবে দোলায় ঠিক সেইভাবে। বাস আসছে। আমি সামনে ঝুঁকে পড়ে পেছন দোলাচ্ছি। মার্টিনার সারভিস আসছে। খপ করে বাসের হাতলটা ধরতে হবে, তারপর ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের কায়দা। ডাইনে বাঁয়ে ডজ করে গোলে ঢুকে যাও। ভেতরে ট্রাপিজের খেলা। ফ্রিস্টাইল রেসলিং। সামারসল্ট। সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ একটি ওলিম্পিক।

জাতীয় পরিকল্পনায় আমরা যেটার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছি, সেটা হল ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা। দাঁড়িয়ে থাকো। বাসের জন্যে দাঁড়াও। দাঁড়িয়েই থাকো। গ্যাসের লাইনে দাঁড়াও। গ্যাসের সঙ্গে ওয়েট লিফটিংও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আজকাল রিকশায় খালি সিলিণ্ডার চাপিয়ে ডিপোয় নিয়ে যেতে হয়। সিলিণ্ডার নামানো, সিলিণ্ডার ওঠানো একটা ভালো ব্যায়াম। হাতের গুলিটুলি বেশ ভালো হয়। ঘাড়ের ব্যায়াম হয়। এই কাজটা আজকাল মেয়েদেরই করতে হয় বেশির ভাগ। ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্য আজকাল ভালই হচ্ছে। কেরোসিনের লাইন। ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে লাইন। রেশনের দোকানে লাইন। দাঁড়াও। দাঁড়িয়ে থাকো। এই দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পায়ের গুপো বেশ ভাল হচ্ছে। কোমরের জোর বাড়ছে। আর বাড়ছে ধৈর্য। মায়েদের স্কুলে ছেলেমেয়ে নিয়ে যাওয়া তারপর ছুটির আগে গেটের সামনে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা। এ সবই হল ওই বহুত্তর জাতীয় পরিকল্পনার অঙ্গ। খেলোয়াড় তৈরি করো।

মাঠে ময়দানে যাবার দরকার নেই। খাটে বালিশের পর বালিশে পিঠ রেখে বোসো ঠ্যাং ছড়িয়ে, সামনে খুলে রাখো টিভি। একদিনের ক্রিকেট তো অনবরতই হচ্ছে। আগে কলেরা টলেরা হলে বলতো মড়ক লেগেছে। এ যেন ক্রিকেটের মড়ক। কোনও কিছু করার উপায় নেই। টিভির সামনে থেকে

নড়ার উপায় নেই। সকাল নটা পনের কি দশটা। বাজার করা কি দোকান করা মাথায় উঠে গেল। দাড়ি কামানো বন্ধ। এমন কি নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠে গেল। যা হয় ভাতে ভাত করেই ছেড়ে দাও। হোল ফ্যামিলি সারি দিয়ে টিভির সামনে। কত বড় সমস্যা! গাভাসকার কেন যে তেড়ে মারছেন না। এটা কি ঠুক ঠুক করে খেলার সময়। মাঠের সঙ্গে ডিরেক্ট টেলি-লিঙ্ক থাকলে, আমার উপদেশ ছুঁড়ে দিতুম, এটা আপনার টেস্ট নয়। আর রেকর্ডে দরকার নেই। আপনার ওই এক দোষ, একের পর এক কেবল রেকর্ড করার চেষ্টা। মারশালের বল কি ওভাবে মারে! ফাস্ট বলে খেলার নিয়ম হল, উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে আসুন, খুব বেশি না, সামান্য কয়েক পা তারপর হাঁকড়ান। একেবারে তছনছ করে দিন। মারুন ছয়। ছয়ের পর ছয়। তারপর ছয়। মেরে গ্যালারিতে পাঠিয়ে দিন।

'এই বলটা মনে হয় হুগলি ছিল।'

'হুগলি নয় গুগলি।'

'গুগলি কি করে ছাড়ে?'

'খুব সোজা, বলটাকে ছাড়ার আগে আঙুলের কায়দায় নিজের দিকে টেনে নেয়।'

'তার মানে ওইদিকের উইকেটে না গিয়ে এই দিকের উইকেটে চলে আসে।'

ওইটাই তো কায়দা। এগোতে পেছোতে, পেছোতে এগোতে, মানে সেই গানটার মতো, যাবো কি যাবো না, পাবো কি পাবো না,

হায়!'

'আর স্পিন?'

'ভেরি সিম্পল। বলটাকে আঙুলের কায়দায় লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে দেয়।'

'কি আঙুল, ভাবা যায়, কি করে শেখে?'

'কেন, কলকাতায় এলেই শিখে যাবে।

প্রেমিকাকে ফোন করার জন্যে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাবে। ঘোরাতেই থাকবে। প্রতিবারই খট। নো কানেকশান। আবার ঘোরাবে। আবার। একদিনেই স্পিন বোলার।'

'আর লেগ-ব্রেক!'

'খুব সোজা, ব্যাটসম্যানের পা লক্ষ্য করে বল ছোঁড়া। সায়েবরা একটা শাস্ত্র বানিয়ে ব্যাপারটাকে কি না কি করে তুলেছে। আসলে কিছুই নয়। ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়ার মতো স্টাম্প পাড়া, কথা ছুঁড়ে যৌথ পরিবার ভাঙার মতো

উইকেটের যৌথ পরিবার ছিটকে দেওয়া। খেলা তো আর জীবনের বাইরে নয়, জীবনটাই খেলা। এই খেয়ালটা রাখতে পারলেই খেলোয়াড়। যেমন নিজের জান সম্পর্কে যে সচেতন সে জানোয়ার। লোহালক্কড় ছাড়া যে ভাবতে পারে না, সে কালোয়ার। যুদ্ধের ইংরেজি হল ওয়ার। ওয়ার প্রত্যয়ান্ত শব্দই হল খেলোয়াড়। ভারত হল ক্রিকেট, ফুটবল আর হকির দেশ। হকিতে আজকাল আমরা প্রায়ই হেরে ভূত হয়ে যাই। হকি আর বাঙালীর একই হাল। দুটোরই এক সময় খুব গর্ব ছিল। সেই গৌরব ভাঙিয়ে আজও চলছে। তবে হকি পশ্চিমবাংলায় তেমন পপুলার হয়নি। অদ্ভুত এক দুর্বোধ্য খেলা। বলটা এত ছোট, চোখে পড়ে না। শুধু লাঠি হাতে পাঁই পাঁই দৌড়। আর গোলকিপারকে এমন অসহায় মনে হয়। সে বেচারার কিছুই করার থাকে না। পায়ে ইয়া দুই লেগগার্ড পরে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। হকি পপুলার না হলেও হকি স্টিক এক সময় খুব কাজে লাগত। মারামারি করার জন্যে, মাথা ফাটাফাটি করার জন্যে। পরমাণু বোমা জন্মাবার পর যেমন কামান, গোলাগুলির যুদ্ধ প্রায় অচল হয়ে এল, সেই রকম ছুরি, ব্লেড, চপার, বোমা, পাইপগান এসে হকি স্টিককে অচল করে দিয়েছে। ক্রিকেটের আলাদা একটা ইজ্জৎ! পরশপাথর যা ছোঁয় তাই সোনা হয়। ইংরেজ যা নাড়াচাড়া করে তাই জাতে উঠে যায়। তারা যদি ড্যাঙ্গুলি খেলত তাহলে ড্যাঙগুলিরও টেস্ট সিরিজ হত। কলকাতার অধিকাংশ বাইলেন এখন ক্রিকেট সাধনার পিচ। যে কোনও খেলারই কিছু টার্মস জানা থাকলেই সমঝদার। যেমন ক্রিকেট মাঠের কোন্ পজিশানের কি নাম মুখস্ত করতে হবে। চেনার দরকার নেই। কণ্ঠস্থ করলেই হবে। স্লিপ, গালি, পয়েন্ট, কভার পয়েন্ট, একস্ট্রা কভার, মিড অফ, সিলি মিড অফ, মিড অন, সিলি মিড অন, লং অন, লং অফ, শর্ট লেগ, স্কোয়ার লেগ, ডিপ স্কোয়ার লেগ, ডিপ ফাইন লেগ। জানতে হবে বল করার ধরনের কিছু নাম গুগলি, ইয়র্কার, স্পিন, লেগব্রেক। আর কি! কেউ তো আর বলছে না, তুমি খেলে দেখাও। তুমি করে দেখাও।

আমি তো খাটে বসে আছি। পিঠে তিন থাক বালিশ। সামনে টিভি। ইণ্ডিয়া ভার্সাস ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ঘরে আরও অনেক দর্শক। ওই সব নাম মাঝে মাঝে বলতে হবে। 'দেখছো দেখছো বলটা ইয়র্কার'। শ্রীকান্তের দোষ কি, ইয়র্কার খেলার ক্ষমতা ব্র্যাডম্যানেরও ছিল না।' 'কপিলের উচিত অজহারকে স্লিপ থেকে গালিতে নামিয়ে আনা।' কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না, বলটা ইয়র্কার ছিল কি না। গুগলি কি না। মাঠে খেলা খুবই কঠিন। খাটে খেলা খুবে সহজ।

স্মরণশক্তি থাকলেই হয়ে গেল। তখন আর হাতের খেলা নয়, মাথার খেলা। টেস্ট ক্রিকেটের অতীত কিছু রেকর্ড মনে রাখতে হবে। কথা বলতে হবে জোর দিয়ে। আর তো কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই। সত্যি খেলোয়াড় হলে পলিটিক্সের মধ্যে পড়তে হবে। তা না হলে, ইণ্ডিয়ান টিমে কেন বাঙালী নেই? গাভাসকারে কাঁপলে মাঝেমাঝেই কেন সংঘর্ষ। কেন একবার এ বসে তো ও ওঠে, ও ওঠে তো সে বসে। সিনেমার মতো ক্রিকেট-গসিপে কাগজ ঠাসা। আমার খাটই ভালো। আর ভালো কিছু বই, ব্লাস্টিং ফর রানস, সানি উইকেট।

ফুটবল তো আমাদেরই খেলা। তবে মুশকিল বাঁধিয়েছে আমার খাট আর টিভি। দুটো ওয়ার্ল্ড কাপ দেখে আমাদের খেলায় আর খেলা পাই না। কথায় কথায় মারাদোনা, সক্রেটিস। আমাদের এখানে খেলোয়াড় যত না খেলে, বেশি খেলে সাপোর্টার। কিছু খেলা আছে যেমন ফুটবল, ক্রিকেট যার ওপর ঝোঁক না থাকাটা ইজ্জতের প্রশ্ন।

আভিজাত্য। ব্লাড সুগার, প্রেসার, হার্ট ডিজিজ হল এরিসট্রোক্র্যাসির লক্ষণ, সেই রকম ফুটবল আর ক্রিকেট। ফুটবলে দুটো বড় দলের যে কোনও একটি দলের সাপোর্টার হতে হবে। আর গোটা কতক টার্মস শিখে রাখতে হবে, যেমন, অফসাইড, ডিফেন্স, ফরোয়ার্ড লাইন, রাইট ইন, রাইট আউট, টাইব্রেকার। এর মধ্যে অফসাইডটা অবশ্যই জানতে হবে। মাঝে মাঝে খেলা দেখতে দেখতে বলতে হবে অফসাইড, অফসাইড। অফসাইড না বললে ভালো রেফারি হওয়া যায় না, বিশিষ্ট দর্শক হওয়া যায় না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে মাঝে মাঝে মাথা দোলাতে হয়, অহো অহো করতে হয়। ফুটবলে সেই রকম অফসাইড। এবারের বিশ্বকাপে, কোনও খেলোয়াড়েরই তো, বিপক্ষের গোলের কাছাকাছি যাবার উপায় ছিল না। এগিয়েছে কি অফসাইড। চেষ্টাচরিত্র করে যাও বা একটা গোল দিলে, অফসাইড। হয়ে গেল। আপদ চুকে গেল। অফসাইডের মতো জিনিস নেই। সব সাধনা এক কথায় পণ্ড। সাধকরা বলেন, সংসার থেকে দূরে থেকে সংসার করাটাই বেদান্তের একটা পথ। নির্লিপ্ত। নিরাসক্ত। তাঁরা উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'মনে করো তুমি একটা সিনেমা দেখছ। সিনেমা দুভাবে দেখা যায়। সিনেমার চরিত্রে নিজেকে হারিয়ে ফেললে, কখনো হাসবে, কখনো কাঁদবে, আতঙ্কের দৃশ্যে চেয়ারের হাতল চেপে ধরবে। সারাক্ষণ সে এক যন্ত্রণা। কিন্তু যদি মনে রাখা যায়, আরে এ তো সিনেমা, এ তো মায়া, তাহলে আর কিছুই হবে না। তখন চোখ আর মন দুটোই যাবে সমালোচনার দিকে। কার অভিনয় ভালো হল। কার ঝুলে গেল! কাহিনীর ত্রুটি কোথায়। সুর

কেমন। পরিচালনা কেমন! খেলা তো খেলার খেলা। বেদান্ত বলছেন, জীবন হল মায়া, অভিনয়, খেলা স্বপ্ন। ইংরেজ শেক্সপীয়ার বলছেন, লাইফ ইজ এ স্টেজ। শান্ত কবি বলছেন, জীবন রঙ্গমঞ্চ। সেই জীবন খেলায়, ফুটবল, ক্রিকেট হল খেলারও খেলা। তার মানে তামাশার তামাশা, মহাতামাশা। টিভির পর্দাই হল খেলার উপযুক্ত স্থান। দূরে বসে ক্যামেরার চোখে দেখো আর মনে মনে খেলো। ওই যে কপিল ব্যাটটা তুলল, তারপর শরীরটাকে স্লাইট বাঁয়ে মুচড়ে সোজা করার সময় দ্বিধাটা কাটাতে পারলে ওইভাবে স্টাম্প হিটকে যেত না। আমি হলে সোজা ছয় মেরে গ্যালারিতে ফেলে দিতুম। শ্রীকান্তর চোখ সেট হবার আগে লেগব্রেক ওভাবে মারলে আউট তো হবেই। আমি হলে আরও দু চারটে মেরে তারপর চার কি ছয় মারবার চেষ্টা করতুম। আমরা আসলে অ্যাডভাইসারের জাত। উপদেষ্টা। কোনটা বেশি প্রয়োজনীয়। অ্যাকসন না অ্যাডভাইস! ভালো উপদেশ না পেলে জীবনে কিছুই করা যায় না। লেখাপড়া, কলকারখানা, মামলা-মকর্দমা, চুরি, ডাকাতি। ভালো উপদেষ্টার উপদেশ না নিলে সব ভেস্তে যায়। খাটে বসে টিভির পর্দায় খেলা না দেখলে খেলোয়াড়কে মানুষ করা যায় না। কোচ এত কাছে থাকেন, খেলার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে থাকেন, তাঁর পক্ষে কি করলে কি হত, এই উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয়? এ একমাত্র খাট-এক্সপার্টরাই দিতে পারে। আমরা সব সময় দিয়েও থাকি। খাটে বসে, গ্যালারিতে বসেও দিয়ে থাকি, ওঁরা শুনতে পান না। আমাদের উপদেশে চললে, কি ক্রিকেট, কি হকি, কি ফুটবল, আমরা হয়ে যেতুম অজেয়।

শুধু! এই শুধুটাই হল আসল, স্ট্যামিনা বাড়াতে হবে। স্বাস্থ্য ভালো করতে হবে। ষাঁড়ের ডালনা না কি বলে, খেতে হবে। তবে ভুঁড়ি বাড়ালে চলবে না। আমাদের কাল হল ভুঁড়ি। আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় অনবরত দৌড়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, বাসের পেছনে, ট্রামের পেছনে, ট্যাক্সি কি মিনির পেছনে। না দৌড়লে কিছুই ধরা যায় না। আরও ভালো দৌড়ের জন্যে নিয়মিত বোমাবাজি, লাঠিবাজি, টিয়ারগ্যাসের ব্যবস্থা তো আছেই। আর আছে পথ-দুর্ঘটনার পর যানবাহনে ইটপাটকেল ছোঁড়া, আগুন, পুলিসের তাড়া। সারা দেশটাকে আমরা খেলার মাঠ করেছি। পথঘাট করে তুলেছি ট্রেকিং-এর উপযোগী। ধর্মতলা থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে ব্রিজ পেরিয়ে বি টি রোড বরাবর ব্যারাকপুর যাত্রা, কোথায় লাগে, লে, লাডাখ, সন্দকফু। তবু আমাদের ভুঁড়ি বাড়ছে। ইণ্ডিয়ান ফুটবল টিম প্রথম ৪৫ মিনিট বেশ দৌড়ঝাঁপ করে,

তারপর "সেকেণ্ড হাফে" হাঁপায়। দরকার প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামের কথায় মনে পড়ল, আমরা সবাই ডাক্তার, সবাই এক্সট্রলজার, আমরা সবাই যোগী। শশঙ্গাসন, ভূজঙ্গাসন, হলাসন, উষ্ট্রাসন, মুখে মুখে ফেরে। বাসে, ট্রামে, বাজারে এমন কি বিয়ের আসরে। কন্যা সম্প্রদান করতে গিয়ে মেয়ের মামা, চাদর গলায় জামাতার নাদুস ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, বাবা, ফুল-শয্যাতেই হলাসনটা শুরু করে দাও। আর পারলে শেষ রাতে উঠে পদহস্তাসন।

তবে খাটে বসে টিভি দেখতে দেখতে এক্সপার্টস কমেণ্টস করার দিন আমার শেষ হয়ে এল। গত বিশ্বকাপে সারা রাত ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে টিভি দেখেছি। বোতলভরা জল ঢুকুর ঢুকুর খেয়েছি। আর বেলা অবধি ভোঁস ভোঁস ঘুমিয়েছি। এতে আমার পালিকার, অর্থাৎ আমি যাঁর গৃহপালিত, তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে। স্নায়ু উত্তেজিত হয়েছে। ফরাসী দেশ হলে আমার নামে লাখ টাকার ডেমারেজ সুট ঠুকে দিত। টিভিতে তালা মেরে এবার থেকে র‍্যাশনিং সিসটেমে, যেমন চাল, গম, চিনি ছাড়ে, সেই রকম প্রোগ্রাম ছাড়বে। সারা রাত হ্যা হ্যা করা চলবে না।

pathagar.net

হাসি কোথায় হারিয়ে গেল

সাহিত্য জীবনেরই ছবি। জীবন থেকে হাসি উবে গেছে সাহিত্য ক্রমশ হয়ে উঠছে গোমড়ামুখো। সাহিত্যের চরিত্র তো আমরাই। আমরা হাহা করে হাসতে ভুলে গেছি, সাহিত্যও হাসতে ভুলেছে। শুধু এদেশ নয় সারা দুনিয়ার জীবন ও সাহিত্যের একই অবস্থা। অবশ্য একটা কথা মনে রাখতে হবে, হাসির ব্যাপারটা হল জীবনের চটুল দিক। যে মানুষ হ্যা হ্যা করে হাসে বা হাসায় তার ব্যক্তিত্বকে আমরা অন্য চোখে দেখি। একটু তাচ্ছিল্যও মেশানো থাকে, লোকটা ভাঁড়, বেশি কথা বলে, বাচাল। যাঁরা জাতের মানুষ, বুদ্ধিজীবী, ইনটেলেকচুয়াল, তাঁরা গম্ভীর প্রকৃতির। গোমড়ামুখো। হাসলেই তাঁদের পার্সোন্যালিটি 'লিক' করে যাবে এই রকম একটা ধারণা। 'থাম্পিং পারর্সোন্যালিটি ক্ষেত্রে হাসা হাসানো বেমানান। যে জজ সাহেব হাসেন তিনি একটু নিরেস। আশুবাবু হাসতেন না। বাঘের মত ব্যক্তিত্বের আবরণে কোনও রকম হাসির ফাটল দেখা দিলে চলবে না। গোর্বাচেভ হাসেন, ক্রুশ্চেভও হাসতেন। কালের বিচারে প্রমাণ হল, ক্রুশ্চেভ ছিলেন জোকারের মতো। তাঁর হাসি ছিল বড় আন্তরিক। সত্যিই হাসতেন, 'কমান ম্যানস লাফ'। পলিটিক্যাল হাসির জাত আলাদা। 'রেগুলেটেড, মেজারড, পাংচুয়েটেড উইথ গ্র্যাভিটি, পাপসিভ।'

মেজারিং গ্লাসে ঢেলে মদ পরিবেশনের মতো। ডিপ্লোম্যাটিক হাসি। রেগন হাসেন। থ্যাচার হাসেন। রাজীব হাসেন। জ্যোতিবাবু কদাচিৎ হাসেন। সচেতন হাসি। সার্কাস্টিক স্মাইল। উচ্চ কোটির বুদ্ধিজীবী, ক্ষমতাশালী মানুষদের হাসা উচিত নয়। হাসবে বোকারা, সাধারণ এলেবেলে মানুষরা। স্ট্যাটাস যত বাড়বে, মুখ তত গম্ভীর হবে। চালাতে হবে 'কনসাস এফার্ট নট টু স্মাইল।' হাসি হল নিচুতলার জিনিস। হাসির লেখা বা রস সাহিত্যও নিচু তলার জিনিস। সাহিত্য বলা হচ্ছে ক্ষমা ঘেন্না করে, আসলে লিটারেচার নয় 'এণ্টারটেনমেণ্ট'। সাহিত্যের যাঁরা জাত বিচার করেন, তাঁরা রস সাহিত্যকে হাসির লেখা বলে একটু উপেক্ষার চোখেই দেখেন। সাহিত্যের সুর যাঁরা বেঁধে দিয়ে গেছেন তাঁরা হলেন শেকসপীয়ার, তলস্তয়, টমাস মান, টমাস হার্ডি, কামু, কাফকা, জিদ, সুইগ, জয়েস, প্রুস্ত প্রমুখ বরেণ্যরা। এঁদের উপজীব্য সমাজ, মনোবিকার, আশা ভঙ্গ, প্রেম, বিচ্ছেদ, যৌনতা, রাজনীতি অজস্র জটিল সব ব্যাপার। জীবনের 'গেল গেল' দিক নিয়েই ছিল তাঁদের কারবার। এর মধ্যে রাশিয়ানদেরই বলা হয় উপন্যাসের জনক। আগের সারিতে আর দুটি নাম যোগ করতে হবে, ডস্টয়েভস্কি আর শেখভ। শেকসপীয়ার তাঁর নাটকে যখনই লঘু সুর আনতে চেয়েছেন, তখনই এনেছেন এক বোকাকে, 'এণ্টার এ ফুল'। অথবা 'জেস্টার'। তাঁরা ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর কথা বললেও হীন পার্শ্ব চরিত্র। সাহিত্যে নায়ক হবার যোগ্যতা তাঁদের ছিল না, দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও। চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রকারের অবস্থারও মিল খুঁজে পাওয়াযায়। সাহিত্যের অঙ্গনে রস-সাহিত্যের লেখকদের একটু হাসির চোখেই দেখা হয়—আরে ও তো হাসির লেখক। সমালোচকরাও খুব একটা সুনজরে দেখেন না।

অথচ হাসির লেখা খুব এটা সহজ ব্যাপার নয়। হা হা করে হাসছে বললে হাসি আসে না। হাসির সিচুয়েশান তৈরি করতে হবে। মানুষ কেন হাসে! হাসে জীবনের অসঙ্গতি দেখে। চরিত্রের অসম আচরণ দেখে। বোকামি দেখে। বিপন্ন মানুষকে দেখে হেসে ওঠার মধ্যে ভদ্রতা নেই। তবু আমরা হাসি। পিছল উঠোনে স্বামী পড়লেন, স্ত্রীর হাসি। হাসি মানে সহানুভূতির অভাব নয়। স্ত্রী এগিয়ে আসবেন হাসতে হাসতে স্বামীকে তোলার চেষ্টা করবেন। পিছল উঠোনে সাবধান হবার উপদেশ দেবেন। তারপর নিজেই উল্টে পড়বেন। তখন দুজনেই হা হা করে হাসবেন। ঘটনার যাঁরা সাক্ষী তাঁদেরও হাসি হবে অকৃত্রিম। এই দ্বিতীয় হাসিটি প্রকৃতই উঁচু দরের হাসি। মোটা হাসি নয়, সূক্ষ্ম হাসি। যে হাসির মধ্যে একটা ছোট্ট দার্শনিক স্পন্দন আছে। শেকসপীয়ার যাকে একটি

লাইনে অমর করে রেখে গেছেন—ফিজিসিয়ান হিল দাই সেল্‌ফ। অন্যকে সাবধান হতে বলার সময় সচেতন হওয়া উচিত, আমি সাবধান কিনা। দেয়ালে পেরেক ঠোকার চেষ্টা করছে ছেলে। বাবা এসে বলছেন, আরে সর সর এখুনি বুড়ো আঙুলের মাথায় হাতুড়ি বসিয়ে দিবি, নখ থেঁতো হয়ে যাবে। সাবধানী পিতা। হাতুড়ির প্রথম ঘাটাই পড়ল তাঁর নিজের আঙুলের মাথায়। ঘটনার যাঁরা সাক্ষী তাঁরা অবশ্যই হাসবেন। যদিও ঘটনায় হাসির উপাদান নেই, আছে পিতৃস্নেহের প্রকাশ। ট্র্যাজেডি যখন কমেডির চেহারা নেয়, তখন তার চেয়ে বড় কমেডি আর কিছু হতে পারে না।

সুষম চরিত্রে হাসি থাকবে, মনোবেদনা থাকবে। আশা থাকবে, হতাশা থাকবে। সেই কারণে শুধু হাসির লেখা শুধু মাত্র কান্নার লেখা হয় না। হাসিকান্নায় মেশানো একটা ব্যাপার হতে পারে। সমস্ত চরিত্রকে সামাজিক পটভূমিকায় ফেলতে হবে তারপর প্যারিসের ন্যাশন্যাল রিসার্চ দ্য সাইণ্টিফিকের এসথেটিকস বিভাগের ডিরেক্টার মাইকেল জেরাফা যেমন বলছেন the proper way to treat a character in a novel is for him first to be conditioned by Society, and secondly to become its victim যা হয়, নায়ক মরে প্রমাণ করেন সমাজ দুষ্ট, অথবা সমাজ সুস্থতা থেকে অনেক দূরে।

সাহিত্য আর জীবনের আলোচনায় বিদেশী উদাহরণই আসে। কারণ এসথেটিকস নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত বিদেশেই। উপন্যাস গল্পের ফর্ম কি হবে, স্টাইল কি হবে, এ সব পরীক্ষা নীরিক্ষা বিদেশেই হয়েছে বেশি। কথায় কথায় প্রুস্ত, সেলিন, ফকনার, স্তাঁদাল, ভস্‌প্যাসোস এসে পড়েন। আসেন সার্ত্র। জয়েস, কাফকা।

আমরা সাহিত্য নিয়ে সাহিত্যের নেপথ্য দর্শন নিয়ে অতটা মাথা ঘামাই না। উপন্যাসের প্রথম যুগে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে বলেছিলেন, তোমরা শিক্ষিত মানুষ, তোমরা যা লিখবে তাই সাহিত্য হবে। একালের একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিমল কর, তাঁর অব্যবহিত আগের যুগের সাহিত্যিকদের লেখার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আমাকে বলেছিলেন, 'তাঁদের মনোভাবটাই ছিল এই রকম আমি যাপের ব্যাটা লিখেছি, তোমাদের পড়তে ইচ্ছে হয় পড়, না ইচ্ছে হয় ফেলে দাও।' লেখকের উদ্দেশ্য যদি পাঠকের মনোরঞ্জন হয় তিনি যদি আত্মজীবনীমূলক লেখার মাধ্যমে নিজের মনোরঞ্জন চান, তাহলে সাহিত্য সমালোচনার প্রেক্ষিতে তিনি সেকেণ্ড রেট নভেলিস্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র কি হাসির লেখা লিখতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। তাঁর

সময়ে সমাজে অজস্র হাসির উপাদান ছিল তাঁর চোখ ছিল কলম ছিল। তিনি ও রাস্তা মাড়ালেন না। কারণ তিনি নভেল লেখার সময় বিদেশী একটি মডেল সামনে রাখলেন, স্যার ওয়াল্টার স্কট। সময় সময় তিনি সরে গেলেন স্যাটায়ারের দিকে। গোপাল ভাঁড়ের চেয়ে ডিকেনস কি সারভানটেস অনেক উঁচুদরের। ভাঁড়ামি হল দিশি ব্যাপার মাটির খুরির মতো। স্যাটায়ার হল বিলিতি ব্যাপার। শ্লেষ আর ব্যাঙ্গের চাবুক মেরে সমাজকে সায়েস্তা করা। বিলিতি হাণ্টার। দীনবন্ধু, অমৃতলালের হাতে এই স্যাটায়ার আরও খুলেছিল। তবে বঙ্কিম ছিলেন অনেক হিসেবী পরিশীলিত, ট্রু আর্টিস্ট। অমৃতলালকে রসরাজ বলা হত। তিনি ছিলেন জনপ্রিয়, তবে সূক্ষ্ম রস বা পরিমিতি বোধের অভাব ছিল। আধুনিক চিত্রশিল্পীদের মতো মানুষের মুখের আদলকে বড় বেশি বিকৃত করে ফেলতেন। হাসির সঙ্গে অপরিমিত বা একসেসের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে আছে।

শরৎচন্দ্র ইচ্ছে করলে অসাধারণ হাসির লেখা লিখতে পারতেন। তাঁর হাতে চরিত্র ছিল। শ্রীকান্তের প্রথম পর্বে সে-ক্ষমতা তিনি দেখিয়েছেন জায়গায় জায়গায়, সরে এসেছেন কারণ তিনি সাহিত্য করতে চেয়েছিলেন, স্যোসাল ইনজাস্টিসকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। কজালিটি আর ডেস্টিনির সমন্বয়। শরৎচন্দ্রকে আমরা বলি জীবনশিল্পী। তিনি জানতেন উপন্যাস হল যা ঘটেছে তার উপস্থাপনা সেই ঘটনার ব্যাখ্যা আর কোন ভবিষ্যতের দিকে চলেছি তার দিক নির্দেশ। The novel thus assumes the guise of oracle. সমাজ ও সময় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। সর্বোপরি সব মানুষেরই একটা অতীত আছে। বর্তমান আছে। ভবিষ্যৎ আছে। সাহিত্যে স্বাক্ষর রেখে যেতে হলে উপন্যাসের ব্যাকরণ মানতেই হবে। প্লট, ক্যারেকটার, সেটিং আর থিম। আর এই চারটি উপকরণই চিরকাল লেখকের সঙ্গে শত্রুতা করে। স্ট্রাকচারের কথাও ভাবতে হয়। উপাদান হল ভাষা আর মনস্তত্ত্ব। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলে অসাধারণ হাসির লেখা লিখতে পারতেন। অজস্র হিউমার ছড়িয়ে রেখে গেছেন।

আসলে হাসির একটা সংজ্ঞা তৈরি করেছে মোটা দাগের সিনেমা ও নাটক। যার সঙ্গে হিউমার বা স্যাটায়ারের যোগ নেই। মানুষের চলা বলা উদ্ভট কর্ম-কাণ্ড থেকে যে হাসি তাতে মাথা নেই, আছে শরীর। ইংরেজি স্ল্যাপস্টিক কমেডি দেখলে মনে হতে পারে, এ আবার কি? উদাহরণ লরেল হার্ডি। দানবীয় সব ব্যাপার স্যাপার। সার্কাসের ক্লাউন মগজধারী মানুষকে হাসাতে পারে

না। হাসে শিশুরা। চার্লি চ্যাপলিন বিশ্ববিশ্রুত, সোস্যাল স্যাটায়ারের জোরে। মানুষ হাসে তাঁর প্রতিভার প্রকাশ দেখে। একটি চরিত্র আর সমাজ তার বিড়ম্বনা তার নিষ্পেষণ কোনওটাই সুখের নয়। ব্যক্তিগত দুঃখ ইউনিভার্সাল হয়ে আনন্দের হাসি টেনে আনছে। আইডেন্টিফিকেসানের আনন্দ। লেখক অথবা অভিনেতা ধরে ফেলেছেন। তাঁর সাফল্যের আনন্দে আমরা হাসি।

মজা বা আনন্দ মোটা দাগের ঘটনায় নেই। আছে বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায়। ত্রৈলোক্যনাথ, রাজশেখর, কেদারনাথ যাঁদের আমরা হাসির লেখক হিসেবে আলাদা একটা জাতে সরিয়ে রেখেছি, তাঁরা সকলেই ছিলেন হিউমারিস্ট স্যাটায়ারিস্ট। কেদারনাথ ছিলেন নির্ভেজাল হিউমারিস্ট। তাঁর লেখা আজকাল আর কেউ পড়ে না। কিন্তু ইংরেজ-বাঙালির তিনি খুব প্রিয় লোক ছিলেন। যখন বাঙালি অ্যাটার্নিদের খুব দাপট। বাঙালি যখন গর্ব করে বলতে পারত, হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে। যখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী বলতে বাঙালিকেই বোঝাত। তাঁর 'আই হ্যাজ ভাদুড়ীমশাই' 'কোষ্ঠীর ফলাফল' 'চীন যাত্রার ডায়েরি একসময়ে বাঙালির খুব আদরের গ্রন্থ ছিল। একসেন্ট্রিক কিছু চরিত্রের কাণ্ড কারখানা ছিল তবে সেইটাই সব নয়, আসল মজাটা ছিল বাঙালির প্রাচুর্যের চিত্রে, সাফল্যের চিত্রে আর হিউমারে। ছোটখাটো স্যাটায়ার ছিল ; তবে চাবুক নয় চিমটি। কেদারনাথের লেখা ভয় পাইয়ে দিত না। ভাঙনের চিত্র ছিল না। পড়তে ভাল লাগত। তিনি যাঁদের নিয়ে লিখতেন তাঁদের জীবন ছিল সুখের।

ত্রৈলোক্যনাথ পুরোপুরি স্যাটায়ার করেছেন। রক্তমাংসের চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর ছিল না। তিনি এমন একটা ফর্ম ও স্টাইল খুঁজে নিয়েছিলেন যা তাঁর নিজস্ব। তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপের উপযোগী। 'ডমরুচরিত' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। ডমরুধর টিপিক্যাল একটি বাঙালি চরিত্র। কৃপণ, স্বার্থপর, ধান্দাবাজ, হুমড়ো, গুলবাজ। এই চরিত্রের মুখ দিয়ে গল্পের আকারে তিনি সে যুগের সমাজ ও লোকাচারকে ব্যঙ্গ করেছেন। সুন্দর টেকনিক সুন্দর ফর্ম অপূর্ব পর্যবেক্ষণ। ডেসমণ্ড মরিস, জন বারজার, গফম্যান অবলোকনকে বিজ্ঞান করে তোলার আগেই ত্রৈলোকনাথ পর্যবেক্ষণকে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর রচনায়। অশিক্ষিতের পয়সা হলে তার কেমন দেখবার প্রবণতা বাড়ে। গ্রাম্য-পণ্ডিতদের চালচলন। স্বামীস্ত্রীর আচরণ। ডমরুধর শিক্ষিত হয়ে অনেক পরে ফিরে এসেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও গৌরকিশোর ঘোষের কলমে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মহাস্থবির জাতকের প্রথমপর্বের কোনও তুলনা হয় না। ইংরেজ আমলের পিতা ও তার সংসার। বিপদ হল, প্রথম খণ্ড অন্য খণ্ডগুলিকে ম্লান করে দিয়েছে।

প্রেমাঙ্কুর হাসির লেখক ছিলেন না। জীবন ধরে টানতে গিয়ে যেখানে যেখানে হাসি ছিল সেইখানে সেইখানে বেরিয়ে এসেছে। শরদিন্দু দ্বিতীয় দাদার কীর্তি লেখেননি। বিমল কর লেখেননি দ্বিতীয় বালিকা বধূ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মূলত ঃ মিষ্টি পারিবারিক ও রোমানটিক গল্পলেখক। তাঁর কলম থেকেও একটি বরযাত্রীই বেরলো। আসলে জাত খোয়াবার ভয়ে অনেক শক্তিশালী লেখক হাসি থেকে সরে গেছেন। কারণ সম্মান নেই, পুরস্কার নেই। পরশুরাম রাজশেখর একমাত্র স্যাটায়ারিস্ট যিনি কখনও হাসির উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেননি। তিনি জানতেন হাসির উপন্যাস হয় না। তিনি ক্যাতুকুতু দিয়ে হাসাবারও চেষ্টা করেননি তবে একজাজারেট করেছেন। মানুষের দুর্বল দিককে ম্যাগনিফাই করেছেন। বাস্তব থেকে সরে এসে কল্পবাস্তব তৈরি করেছেন প্রয়োজনে। তাঁর নিজস্ব ফর্ম ও স্টাইলে সেটা মানিয়ে গিয়েছে। ফ্যাবুলেশান। লেস রিয়ালিস্টিক অ্যান্ড মোর আর্টিস্টিক। একজন আর্টিস্টের সে স্বাধীনতা আছে। The of fiction has something in common with the are of painting.

হাসির ব্যাপারটা পুরোপুরি ভিস্যুয়াল। চরিত্রের বিড়ম্বনা চোখের সামনে দেখতে হবে। তার মুখ চোখের ভঙ্গি, হাঁটা চলা, কথাবলা। যে কারণে চার্লি হলেন চিরকালের ক্লাউন। ছায়াছবির পর্দা আর মঞ্চ নিজস্ব ঢঙে হাসির একটা ব্র্যান্ড তৈরি করেছে। ছাঁচ তৈরি করে ফেলেছে, যে ছাঁচের আদলে বুদ্ধির হাসি, স্মিত হাসি আসে না। অক্ষরের শরীরে হিউমার স্যাটায়ার খোলে ভালো। হা হা হাসির রেখা তেমন ফোটে না। ভূত দেখা এক অভিজ্ঞতা, ভূতের গল্প অনেক জলো। গতানুগতিক। আমাদের হাসি কমেনি, ধরন পাল্টেছে। উপাদান ভিন্ন হয়েছে। বাজার থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোক হেসে কুটোপাটি। কারণ? আরে মশাই কানা বেগুনের দাম দশ টাকা। শুনেছেন কখনও। প্রফুল্ল নাটকের শেষ দৃশ্যে গিরীশবাবু, 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—বলে কাঁদতেন না, হা হা করে হাসতেন। কান্নাকে হাসি করে তোলার আর্ট বড় কঠিন। তা ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উপন্যাস বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মন নিয়ে। রাজনীতি নিয়ে। সেক্স নিয়ে। We live in an age in which fiction has conspicuously grown more provisional more anxious more self questioning than it was a few years ago.—Malcolm Bradbury.

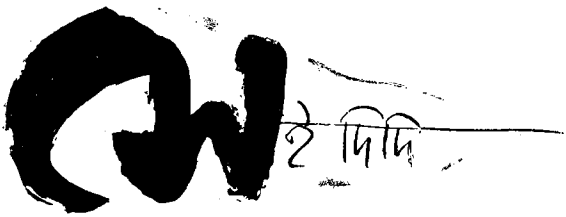

এত মারামারি কাটাকাটি, মামলা, মোকদ্দমা, ভুল বোঝাবুঝি, এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু উৎসব, পালাপার্বন, পথে ঢ্যামকুড়কুড় পশ্চাৎ-ভঙ্গ বিসর্জন নৃত্য, সবই বজায় আছে। এই হল বাঙালীর বিউটি। এদিকে টিভিতে পেয়ারী দুফণের খেল চলেছে, ওদিকে বৃদ্ধা মাতাকে যমে ঠ্যাং ধরে টানছে। এদিকে সত্যনারায়ণ হচ্ছে বউরা সিন্নি মাখছে, ওদিকে বড়ভাই আর মেজভাই কাজিয়া করছে, একটু পরেই হয়তো তাজিয়া বেরিয়ে যাবে। এদিকে প্যাণ্ডেলে মায়ের সন্ধি পুজো হচ্ছে ধূপ-ধুনোয় অন্ধকার, ভক্তদের মা মা আর্তনাদ, ওদিকে যুব শক্তি শাড়ির আঁচল ধরে টানাটানি করছে। এদিকে চণ্ডী বলছেন, 'স্ত্রীয়াঃ সমস্তা সকালা জগৎসু', ওদিকে ভোগের জন্যে আঁচড়াআঁচড়ি, আদর্শবান যুবক প্রতিবাদ করতে গিয়ে সকলের চোখের সামনে প্রাণ দিচ্ছে। এর নাম ধর্ম। এর নাম, বারো মাসে তেরো পার্বণ করে আমাদের ধার্মিক হবার কসরৎ।

যাক এই নিয়ে নাকে কেঁদে লাভ নেই। এই রকমই হয় মানুষের সংসারে। এরই মাঝে আমাদের আসতে হবে বাঁচতে হবে, মরতে হবে। উপায় নেই। আমাদের নিয়তি। আমরা আমাদের ভাই হয়ে আসব, বোন হয়ে আসব, পিতা

হব, মাতা হব। চেষ্টা করব ভালবাসা নিয়ে, ভালবাসা দিয়ে বেঁচে থাকতে। চেষ্টা করব কাছে টানতে, চেষ্টা করবো আমাকে কাছে টানতে, সবাই মিলে সদ্ভাবে বেঁচে থাকার অসীম আনন্দ। হাজার হাজার টাকা সে আনন্দ দিতে পারবে না, কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থ, অহংবোধ, ঈর্ষা, লোভ আমাদের সেই আনন্দ পেতে দেয়না। বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের দুই বউ, একসঙ্গে মিলেমিশে কি সুন্দর থাকা যায়, থাকবে না। দুই ভাই, মায়ের পেটের ভাই, একই মায়ের কোলে মানুষ, ছেলেবেলায় একই সঙ্গে বল খেলেছে, গল্প শুনেছে, এক বিছানায় ঘুমিয়েছে, একসঙ্গে স্কুলে গেছে, আর যেই না বড় হল, অহং আর স্বার্থবোধ জাগল, এ ওকে দেখতে পারে না, ও একে। মুখ দেখাদেখি বন্ধ। নিজের ভাইকে ফেলে বন্ধুর সঙ্গে হলায় গলায়। শলাপরামর্শ, সিনেমা, রেস্তোরাঁ, গালগল্প, বড় প্রাণের জন। পরের কথায় ওঠা বসা, পরের খিদমত খেটে মরা, আর ঘর গেল ভেসে। নিজের ভাই পড়ে মরে গেলেও মুখ ফিরিয়ে চলে যাবো, আর প্রাণের বন্ধুর কুকুর অসুস্থ হলে কমলালেবু হাতে ছুটে যাবো। এই হল আমাদের খেলা।

এমন অনেক পরিবার আছে, যে পরিবারে ভাইবোনে মুখ দেখাদেখি নেই, অথচ ভাইবোনের সম্পর্ক কতই না মধুর! বোন যদি দিদি হয়, তার ভূমিকা অনেকটা মায়ের মতো, বন্ধুর মতো তো বটেই। ছোট ভাইটি কোলে করে তার দিন কেটেছে। মা ব্যস্ত কাজে, ছোট ভাইকে কে দেখবে, দিদি। বয়েসের ব্যবধান যতই কমই হোক, সে দিদি। ভাইটিকে কোলে করে হয়তো নড়তে পারছে না, তবু তার দিদিগিরি ফলানো চাই। দুষ্টুমি করলে হয়তো গাল টিপে দিল, কিংবা চটচট চাঁটি। আবার কান্না থামাবার জন্যে মুখ থেকে লজেন্স বের করে ঢুকিয়ে দিল ভাইয়ের মুখে। এই ভীষণ সংসারে সেই সব স্বর্গীয় দৃশ্যের কোনও তুলনা আছে—ক্ষুদে দিদি, ক্ষুদে ভাইকে চান করিয়ে, গা মুছিয়ে দিচ্ছে। মাছের কাঁটা বেছে, ভাতের নাড়ু করে কচি হাঁ-য়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মুখ মোছ তে মোছাতে হঠাৎ চুমু খেয়ে বলছে—সোনাটা।

সে কি ভোলা যায়, দিদির কাছে পড়তে বসা। দিদির অকারণ শাসন। ভায়ের চিৎকার—মা দ্যাখো না, আমায় মারছে। আবার দামাল ভাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে দিদির কোলে, চুল ধরে টান। দিদির চিৎকার—মা আমায় মারছে, কান ধরে ঝাঁকানি, বাঁদর ছেলে। শেষে দুজনেরই বরাতে মায়ের প্রহার। কথা বন্ধ আড়ি। শেষে জলভরা চোখে ভাই এল ভাব করতে—রাগ করেছিস দিদি। আবার ভাব।

এমনি করেই কিন্তু দিন যায় না। কৈশোরের স্বর্গ থেকে যৌবনে চির বিদায়।

ভাই তার সংসারে, গলায় প্রেমিকা। ননদের নাম কাঁটা। কোন অখ্যাত অঞ্চলে কার অভাবের সংসারে পড়ে আছে সেই দিদি। মনেও পড়ে না। দিদির কিন্তু মনে পড়ে—চিঠি দেয়। উত্তর যায় না এদিক থেকে। ভালোবাসার উপহার অহংকারে ভেসে যায়—এই অখদ্যে মাল দিয়েছে তোমার বোন। কতই বা দাম। কপাল থেকে চন্দনের টিপ মুছে ফেলতে সময় লাগে এক সেকেণ্ড।

pathagar.net

ভালোবাসা মোরে ভিকিরি করেছে

ওই যে মোড়ের মাথায় হলুদ রঙের বাড়িটা দেখছেন, ওই বাড়িতে আমি থাকি। আমি থাকি, আমার বউ থাকে, আমার এক ছেলে আর মেয়ে থাকে। ছেলে বড় আর মেয়ে ছোট। আমি ইচ্ছে করলে আমার বাড়ির বাইরে একটা মার্বেল ফলক লাগাতে পারি ; তাইতে লেখাতে পারি 'প্ল্যানড্ ফ্যামিলি।'

আমি ইচ্ছে করলে আমার পরিবারের সভ্য সংখ্যা আরো অনেক বাড়াতে পারতুম। সে ক্ষমতা আমার ছিল। সাহসে কুললো না, ফলে হাম্ দো, হামারা দো। একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি, এখন যা বাজার পড়েছে, তাতে যে কোনও লোকের তিনটে ছেলে হলে ভাল হয়। একজন মাস্তান হবে, আর একজন হবে নেতা, আর একজন পুলিশ। একেবারে আদর্শ পরিবারের কাঠামো। হেসে খেলে রাজত্ব করে যাও। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভাব হলেও জাতীয় সম্পত্তির অভাব নেই। পার্কের রেলিং খুলে বেচে দাও। ট্রেনের কামরা থেকে আলো, পাখা, গদি আপন ভেবে খুলে নিয়ে এসো। চারদিকে নানা রকম কনস্ট্রাকসান হচ্ছে, প্রচুর মালপত্র পড়ে আছে রাস্তাঘাটে। একটু কষ্ট করে তুলে আনো। এনে আবার সেইখানেই ফিরিয়ে দাও। একেই বলে লেনদেন। জমি কেন, বাড়ি কর, গাড়ি কর। ফুরফুরে নেশা কর। এদিক সেদিক যাও।

শহরে আবার বাঈজী-কালচার ফিরে আসছে। ওড়াও, ওড়াও, দু হাতে কারেনসি নোট ওড়াও তা, এই নয়া বাতাসের পাল তুলতে পারিনি আমি। আমার পালে সেই পুরনো বাতাস। ধর্ম নিয়ে আদর্শ নিয়ে, এক বিশ্রী অবস্থা। লোভ আছে, সাহস নেই।

আমি আমার বউকে ভীষণ ভয় পাই। সব আদর্শবাদী স্বামীই পায়, আমি একটু বেশি পাই ; কারণ আমি ঝগড়াঝাঁটি ভীষণ অপছন্দ করি। আমি মনে করি কোনও ভদ্রলোকের, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয়। আর স্ত্রী আর হেডমিস্ট্রেসে খুব একটা তফাত নেই। সব স্বামীই স্ত্রীদের ছাত্র। কত কি শেখার আছে! আর সেই শিক্ষা তো স্ত্রীর পাঠশালাতেই হয়। আমার স্ত্রী এই এতদিন পরেও প্রায়ই বলে, 'কবে যে তুমি একটু মানুষ হবে?'

'আমি এখন তাহলে কী?'

স্কুলে শিক্ষকরা চিরকাল বলে এসেছেন, 'এমন সিনসিয়ার গাধা খুব কম দেখা যায়।'

আমার বউ স্পষ্ট মুখের ওপর বলে, 'তুমি একটা অমানুষ।' অর্থাৎ জন্তুর জান্তব গুণাবলী চোলাই করে ঈশ্বর আমাকে মানুষের বোতলে পুরে পৃথিবীতে ঠেলে দিয়েছেন। আর আমার স্ত্রী দয়া করে সেই বোতলটিকে তুলে নিয়েছে। কত বড় উদারতা! এই উদারতার জন্যে চিরকাল আমাকে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। 'সিট ডাউন', বললে বসতে হবে। 'গেট আপ', বললে উঠতে হবে।

আমি আমার ছেলেমেয়েদের কোনওভাবেই জানতে দিতে চাই না, যে আমি প্রেম করে বিয়ে করেছি। প্রেম বাঙালীর রক্তে হেমোগ্লোবিনের মতো মিশে আছে। নারী জাতির প্রতি প্রেম। বিয়ের সময় আমরা যে পণ চাই, বিয়ের পরে বধূ নিগ্রহ করি, কখনও পুড়িয়ে মারি, বা সিলিং-এ ঝুলিয়ে দিই, সেটা স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ নয়, শ্বশুর মশাইকে ঘৃণা। অধিকাংশ শ্বশুরই পাকা ব্যবসাদার। কৃপণ। হাত দিয়ে জল গলে না। চোখের চামড়া নেই। ধুরন্ধর প্রকৃতির ব্যক্তি। সুন্দর সুন্দর মেয়ের পিতা হয়ে বিয়ের বাজারে লাঠি ঘোরাতে চান।

আমি একটু বোকা ধরণের উদার প্রকৃতির মানুষ, তাই ঠকে মরেছি। আমার ভয়রাভাই, যে আমার বউয়ের বোনকে বিয়ে করেছে, সে পাকা ছেলে। আমার শ্বশুরমশাইয়ের কানটি মলে কম বাঁধিয়েছে! ভাবলে মনটা কেমন করে ওঠে! একই বউকে দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করা যায় না। যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। পস্তে লাভ নেই। ভালবাসার পলস্তারা দিয়ে সব মসৃণ করতে হবে। ভালবাসা জিনিসটা ভোরের শিশিরের মতো। সংসার সূর্যে নিমেষে উবে যায়।

আমার হলুদ রঙের একতলা বাড়ি। সবে হয়েছে। এখনও অনেক কাজ বাকি। এই বাড়িই আমার বাঁশ হয়েছে। আমার জ্ঞানী বউয়ের পরামর্শে সব বেচেবুচে, ধার দেনা করে তৈরি হয়েছে ইটের খাঁচা। এখন বাজার করার পয়সা জোটে না। ভিখিরির অবস্থা। অফিস থেকে লোন নিয়েছিলুম। কাটতে শুরু করেছে। মাইনে হাফ হয়ে গেছে। অথচ সংসার খরচ কোনও ভাবেই কমানো যাচ্ছে না। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে ঘনঘন বাজেট অধিবেশন হয়ে গেছে। কোনও দিক থেকেই কোনও সুরাহা হয়নি। আমরা তো আর স্টেট নই যে মদের ওপর, কি ডিজেলের ওপর কি সিগারেটের ওপর, কি গমের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে দেবো! এ হল ফ্যামিলি। একটাই রাস্তা, খরচ কমানো।

দুধের খরচ কমানো যাবে না। ছেলে মেয়ের হেলথ খারাপ হয়ে যাবে। ওরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ। দেশের ভবিষ্যৎ। ঠিক মতো লালনপালন করতে পারলে কত কি হতে পারে। এদেশে এখনও কেউ আইনস্টাইন হয়নি, রাসেল হয়নি। এদেশে অ্যাব্রাহাম লিংকনেরও খুব প্রয়োজন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে যাচ্ছেতাই। সারা ভারতে রাজনীতির চোরাই তৈরি হচ্ছে। চতুর্দিকে আড়ং ধোলাই শুরু হয়েছে। সারা বিশ্ব হিংসায় ভরে গেছে, একজন যীশু এলে মন্দ হয় না। আমার শিশুটিও যীশু হতে পারে। কে কি হবে, বলা তো যায় না? আমার বউ অবশ্য সন্দেহ করে, 'তোমার মত পিতার সন্তান কত দূর কি করতে পারবে সন্দেহ আছে। গাছ অনুযায়ীই তো ফল হবে।' আমি ভয়ে বলতে পারি না যে, 'তুমি তো জমি। বীজ ধারণ করেছিলে। সেই জমিতেও তো আমার সন্দেহ। বীজের দোষ না জমির দোষ।' সাহস করে বলি না। বললেই দাঙ্গাহাঙ্গামা বেঁধে যাবে। মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়ায় আমি পারবো না; কারণ আমার মেমারি তেমন ভালো নয়। মামলা আর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় 'পাস্ট রেফারেন্সের' খুব প্রয়োজন হয়। দশ বছর আগে এক বর্ষার রাতে আমি কি বলেছিলুম, আমার বউয়ের মনে আছে। লিভিং রেফারেন্স ম্যানুয়েল। মাঝে মাঝে মনে হয় মেয়েদের স্মরণশক্তি বেশি, না বিয়ে হলেই স্মরণশক্তি খুলে যায়! আমার তো কালকের কথা আজ মনে থাকে না। টেপের মতো সব ইরেজ হয়ে যায়।

বেশ, দুধ কামানো যাবে না। রোতলের সাদা জল, পলিথিনের ব্যাগে ভরা থলথলে সাদা জলে বাঙালীর ধৃতি, পুষ্টি, মেধা। সারা পরিবারে ভাগ বাঁটোয়ারায় আধকাপ ম্যাথাপিছু পেটে না গেলে মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা দেখা দেবে। গ্যাসের খরচ কামানো যাবে না। গ্যাস দিয়ে আর গ্যাস নিয়েই তো আমাদের

জীবন। চাবি ঘুরিয়ে জ্বালতে জ্বালতেই বেশ কিছুটা বাতাসে পাখা মেলে উড়ে যাবে। সারা বাড়ি খুশবুতে ভরে যাবে। হাতের কাছে সব গুছিয়ে নিয়ে রাঁধতে বসার নির্দেশ থাকলেও সম্ভব হবে না। সেইটাই আমাদের চরিত্র। বিদ্যুতের বিল উত্তরোত্তর বাড়বে বই কমবে না। লোকলৌকিকতা যা ছিল তাই থাকবে। শিক্ষার খরচ দিন দিন বাড়বে। প্রতিটি বিষয়ের জন্যে এক একজন গৃহশিক্ষক। তা না হলে পরীক্ষায় গোল্লা। অশ্রু বিসর্জন করে, নাকে কেঁদে লাভ নেই। যে খেলার যা নিয়ম। খরচ কমাবার কোনও রাস্তা নেই। শুধু বেড়ে যাও, ছেড়ে যাও, উড়িয়ে যাও, পুড়িয়ে যাও।

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, ওয়েস্ট নট ওয়াণ্ট নট। অপচয় বন্ধ করো, অভাব হবে না ; কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়! মহিলাদের স্বভাব হল, তাঁরা অন্যকে উপদেশ দেবেন, সেই উপদেশের সিকির সিকি নিজেদের জীবনে পালন করবেন না। আমার স্ত্রী পাশের বাড়ির বউটিকে উপদেশ দেন, স্বামী অফিস থেকে ফেরা মাত্রই অমন মেজাজ দেখাও কেন? আগে আসতে দাও, বসতে দাও, শান্ত হয়ে চা-টা খেতে দাও। তারপর যা বলার বলো। বলবে বই কি। স্বামীকে বলবে না তো কাকে বলবে! পৃথিবীতে ওই একটাই তো লোক! জীবন সাথী।'

এই উপদেশ আমি নিজের কানে শুনেছি। কিন্তু আমার বেলায় ঠিক উলটোটাই হয়। আপনি আচরি ধর্ম, এই নীতিবাক্যটি ভদ্রমহিলা হয়তো বহুবার শুনেছেন ; মগজে তেমন ছাপ ফেলেনি। ঢোকার দরজার মুখে একটা পাপোশ আছে। সেইখান থেকেই শুরু হয়। 'কী হোলো! ওখানে পাপোশটা কী জন্যে রাখা হয়েছে! ছাপ্পান্ন টাকা নগদ দাম দিয়ে কেনা হয়েছে কী কারণে! তোমার হাইজাম্প প্র্যাকটিশ করার জন্যে! ওই নোংরা জুতো নিয়ে ছাগলের মতো লাফিয়ে আমার এমন সুন্দর মোজাইক মেঝেতে দাগ ফেলে দিলে! জানো না মোজেকের মেঝে কী সাংঘাতিক সেন্সিটিভ। একবার দাগ ধরে গেলে সহজে উঠতে চায় না। অকজ্যালিক অ্যাসিড ঘষতে হয়, মোমপালিশ করতে হয়। আর রাস্তার জুতো নিয়ে ভেতরেই বা আসা কেন? ন্যাস্টি হ্যাবিট!'

আমারও মেজাজ ঠিক থাকে না। জ্যাম ঠেঙিয়ে, ধুলো, ঘাম, ডিজেলের ধোঁয়া গায়ে মেখে, ঘাড়ে পিঠে সহযাত্রীদের রদ্দা খেয়ে ময়ান দিয়ে ঠাসা লুচির ময়দার তালের মতো বাড়ি ফিরে দরজার মুখ থেকেই শুরু হলে, কার ভাল লাগে! আমার মোজেক! তোমার মোজেক মানে! পুরো প্রোডাকসানটাই তো আমার!

চিত্রনাট্য, পরিচালনা, সংগীত, গীতরচনা, সবই তো আমি করেছি। ভাদ্রমাসের রোদে পোস্টাপিসের পিওনের ছাতা মাথায় দিয়ে মিস্ত্রী খাটিয়েছি। নাক দিয়ে সিমেণ্ট টেনেছি। পা দিয়ে মশলা দলেছি। জোগাড়ের অভাব হয়েছে যেদিন, ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা জল ঢেলে ইট ভিজিয়েছি। পয়সা ছিল না ; মোজেক ঘষাবার মেশিন আনতে পারিনি, নেজেই হাঁটুগেড়ে বসে পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে দানা বের করেছি। সেই থেকে আমার হাঁটুতে কড়া, কোমরে সায়টিকা। ভাদ্রের রোদে পুড়ে জণ্ডিস। সেই থেকে চোখ দুটো ঘোলাটে হলুদ। আর এখন, সেই সাধনার পীঠস্থানে জুতোসুদ্ধ পা রেখেছি বলে ধাঁতানি খেয়ে মরছি।

বেশ চড়া গলাতেই বলতে হয়, 'জুতো তাহলে রাখবো কোথায় ! মাথায় !'

'মাথায় তো রাখতে বলিনি ; বাইরের সিঁড়ির একপাশে রাখতে পার।'

'তিনদিন আগে আমার নতুন কোলাপুরির একটা পাটি কুকুরে মুখে করে নিয়ে গেছে।'

'গাছে তুলে রাখো।'

জমিটা যখন কিনি, তখন সেখানে একটা ফলসা গাছ ছিল। গাছটাকে কায়দা করে বাঁচানো হয়েছে। সেই গাছে জুতোটাকে ঝোলাবার পরামর্শ। গাছ থেকে ফল পাড়ে। ফলের বদলে রোজ সকালে জুতো পাড়বো ? বলা যায় না ডাল থেকে একটা সুদৃশ্য সিকা ঝুলিয়ে দিবে। এ তো কায়দার যুগ। রোজ জুতো সিকেয় তুলে বাড়ি ঢুকতে হবে।

আমার স্ত্রীর একটা ম্যানিয়া মতো হয়ে গেছে। ঘুরছে ফিরছে, ঘাড় কাত করে পাশ থেকে আলোর বিপরীতে দেখছে মেঝেতে দাগ পড়েছে কি না। পড়লেই স্পেস্যাল ন্যাতা দিয়ে, জল দিয়ে, লিকুইড ডিটারজেণ্ট দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছে। আমারও রেহাই নেই। বসতে দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছে, 'কি বসে বসে বাসী খবরের কাগজ পড়ছ ! যাও না, সিঁড়ির ধাপ আর মেঝের স্কার্টিংগুলো একটু পরিষ্কার করো না'।

বাড়ি করার পর একেই তো আমার চেহারাটা অর্ধচন্দ্র মুনির মতো হয়ে গেছে তার ওপর চব্বিশ ঘণ্টা এই অত্যাচার। দেয়ালে পিঠ রেখে বসা যাবে না। দেয়ালের রঙ চটে যাবে। মাথার পেছন লাগানো যাবে না। ছোপ ধরে যাবে তেলের। বাথরুম থেকে বেরিয়ে পাপোশে পনের মিনিট পা ঘষতে হবে। জল থাকলেই ঝকঝকে মেঝেতে দাগ পড়ে যাবে। কোথা থেকে এক জোড়া ছেঁড়া মোজা জোগাড় করে দিয়েছে, সেই মোজা পরে রোজ সকালে সারা বাড়ির মেঝে পরিষ্কার করো। টুথব্রাশ দিয়ে গ্রিলের ভাঁজ থেকে ধুলো ঝাড়ো। ঘাড় উঁচু

করে দ্যাখো সিলিং-এর কোথাও ঝুল ধরছে কিনা। এই সব করতে করতেই বেলা কাবার। না পড়া হয় সকালের কাগজ। না হয় ভাল করে খাওয়া। কোনওরকমে নাকে মুখে গুঁজে ছোট অফিস। প্রায়ই দাড়ি কামানো হয় না। খোলতাই চেহারায় এক মুখ কাঁচাপাকা দাড়ি। লোকে জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে বলুন তো আপনার?'

'ভাই, বাড়ি হয়েছে।'

'বাড়ি হলে এই রকম হয় বুঝি?'

'অনেকে টেঁসে যায়, আমি তো তবু বেঁচে আছি।'

একদিন সকালে বাড়িঢোকার মুখের মেঝেটা খারুয়া দিয়ে মুছছি আর পাশে হেলে হেলে দেখছি দাগ পড়েছে কি না, এমন সময় আমার প্রতিবেশী আশুবাবু এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে বিশুবাবু আছেন?'

আমার নামই বিশুবাবু। ভদ্রলোক চিনতে পারেননি। আমি বললুম, 'বাজার গেছেন।'

'এলে তোমার বাবুকে বোলো দেখা করতে। শুধু বলবে ইনকামট্যাক্স।'

আমি ন্যাতা ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম। 'ইনকামট্যাক্স মানে?'

আশুবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'আরে আপনিই তো বিশুবাবু! কি করছিলেন অমন করে, এমন অদ্ভুত পোশাকে?'

'হাউস মেনটিনেনস। মেঝে পালিশ।'

'মেঝে পালিশ না করে নিজেকে পালিশ করুন। চেহারার একি দশা! পায়ে মোজা পরেছেন কেন? শরীর গোলমাল।'

'না, না এটা আমার স্ত্রীর ব্যবস্থা। মেঝেতে দাগ পড়বে না।'

'কত রঙ্গই জানেন। কত রকমের পাগল আছে এই দুনিয়ায়। থাক, কাজের কথাটা বলে যাই। বাড়ি তো করলেন, ডিক্লেয়ারেশান দিয়েছেন ইনকাম ট্যাক্সে?'

'সে আবার কি?'

'সে আবার কি, বুঝিয়ে ছেড়ে দেবে। বাড়ি তো করলেন, টাকাটা এল কোথা থেকে? কত টাকার সম্পত্তি? ঠিক ঠিক জবাব দিতে না পারলে হাতে হ্যারিকেন।'

'কেন, স্ত্রীর কিছু গয়না বেচেছি। ধার দেনা করেছি। কিছু জমেছিল। সব ঢুকিয়ে দিয়েছি ইটের পাঁজায়।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে লাখ দুয়েক গলে গেছে। মোজাইক মেঝে। সেগুন

কাঠের জানলা-দরজা। বরফি গ্রিল। কত গয়না বেচলেন মশাই! ধারই বা পেলেন কোথায়! এই বাজারে সংসার চালিয়ে জমেই বা কত?'

'মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

'সন্দেহ নয়, সাবধান করতে এলুম বন্ধু হিসেবে। ওই যে মোড়ের মাথায় ক্ষীরওলা বাড়ি করেছে। ওই যে সিলভার গ্রে রঙের বাড়িটা। কোন হিতৈষী বন্ধু একটি চিঠি ছেড়ে দিলে। ব্যাস্ কেঁচো খুঁড়তে সাপ।'

এইরকম চিঠি ছাড়ে না কি?'

ছাড়বে না? বাঙালীরা কত সমাজসচেতন জানা আছে আপনার? এই যে হালফিল কালীপুজো গেল; কত আনন্দ দিয়ে গেল বলুন তো! ছেলেরা অষ্টপ্রহর গান শোনাবার ব্যবস্থা করেছিল। সারাদিন, সারারাত, মুহুর্মুহু বোমা ফাটিয়ে শরীরের রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে দিয়ে গেল। দু চারজন টেঁসেও গেল মানে মোক্ষলাভ হল। ছোটকথা কানে তোলার উপায় ছিল না। আবগারি বিভাগের রোজগারও বেড়েছিল। সকলেই মা-মাহা করছে। কানখাড়া করে আবার শুনলুম, মা নয় বলছে মাল। ইয়াং জেনারেশন একেবারে টং। বিসর্জনের প্রসেসন যাচ্ছে। একজন ধাক্কা মেরে নর্দমায় ফেলে দেয় আর কি! দেখি কেই প্রকৃতিস্থ নয়। সকলের মুখেই চুল্লুর গন্ধ। সমাজসচেতন না হলে পারত এসব!'

আপনিও তো বাড়ি করেছেন। ডিক্লেয়ারেশান ফাইল করেছেন?'

'আমার বাড়ি তো আমি আমার বউয়ের নামে করেছি। চালাক লোকেরা তাই করে।'

আশুবাবু দুর্ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। এক কাপ পানসে চা নিয়ে 'দেওয়ানি খাশ'-এ পা ছড়িয়ে বসলুম। আগে একশো টাকা কেজির ফুরফুরে গন্ধঅলা চা নিয়ে বসতুম! সেই চা এখন চল্লিশ টাকায় নেমেছে। না আছে লিকার, না আছে ফ্লেভার। বাড়ি করে 'পপার' হয়ে গেলুম। এখন দুম করে ভারী রকমের কারোর অসুখ করলে বিনা চিকিৎসায় মরবে। সামনেই আসছে বিয়ের মাস। গোটা তিনেক নিমন্ত্রণ পত্র আসবেই। বাড়িতে দেবার মতো যা ছিল সবই দেওয়া হয়ে গেছে। মাছের তেলে মাছ ভাজার আর উপায় নেই।

সেই হলুদ বাড়ি থেকে কিছুক্ষণ পরেই অষ্টাবক্র মুনির মতো একটি লোক বেরিয়ে এল। হাতে একটা চাউস ব্যাগ। পকেটে দশটি মাত্র টাকা। সেই টাকায় আলু হবে, কপি হবে, মাছ হবে, মাংস হবে। মাথাধরার ওষুধ হবে। গায়ে মাখা সাবান হবে। দাড়ি কামাবার ব্লেড হবে। আমার বউ বলে বাড়ি-

অলাকে একটু কষ্ট করতে হয়। ট্যানা পরে ঘুরতে হয়। ভোলামহেশ্বরের কথা ভাবো।

উলটো দিক থেকে বিকট শব্দ করে একটা মটোরবাইক আসছে। দেখেই বুকটা ধক করে উঠল। গ্লিলঅলা এখনও অনেক টাকা পাবে। মোটাসোটা, গাঁট্টাগোঁট্টা এক ভদ্রলোক। আমাকে জমিয়ে একটা ঘুসি মারলে আর তিন দিন উঠতে হবে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে দাঁড়ালুম। পাওনাদারের কাছে পেছনও নেই সামনেও নেই। মোটরবাইক ঠিক আমার পেছনে এসে থেমে পড়ল। ভুট্‌ভুট্‌, ভুট্‌ভুট্‌ মধুর শব্দ। সেই শব্দ ছাপিয়ে গলা, 'আপনার কাছেই যাচ্ছি। আজ কিছু দেবেন তো?'

ঘুরে দাঁড়াতেই হল। ভেবেছিলুম সকালেই পাওনাদারের মুখ আর দেখবো না। বললুম, 'বাজারে যাচ্ছি। আপনি যান। ওসব এখন আমার স্ত্রীই দেখছেন।'

মোটরবাইক ভটভটিয়ে বাড়ির দিকে ছুটল। কি হবে তা জানি না। মোড়ের কাছাকাছি এসে দেখি একটা সাইকেল ঢুকছে। মরেছে। ইটখোলার মালিক। বেশ ভালই পাওনা। নগদে শুরু করেছিলুম। ধারে ফিনিশ করেছি।

'এই যে বিশুবাবু, আপনার ওখানেই যাচ্ছি। আজ কিছু দেবেন তো?'

'চলে যান। সব আমার স্ত্রীর কাছে।'

সাইকেল চলে গেল। মনে পড়ল অল রোড লিডস টু রোম। হরেনের পান বিড়ির দোকানের কাছাকাছি আর এক পাওনাদার। ফটিকবাবু। আমার কনট্র্যাকটর, নীলরঙের শার্টের বুকপকেটটা ডিমভরা ট্যাংরা মাছের পেটের মতো, প্রায় ফাটোফাটো অবস্থা। আমি জানি ওই পকেটে কি আছে। সেই মারাত্মক লোমওঠা কুকরের মতো মলাটওলা মাঝারি মাপের নোটবুকটা আছে। যার পাতায় পাতায় বর্গমিটার আর ঘনমিটারের হিসাব। আমাদের মতো চিৎ হয়ে শোয়া কুঁজোদের বধ করবার ব্রহ্মাস্ত্র। খাতা খুলেই বলবেন, লিনট্যাল, ছাজা, সানশেড, বিম, পিলার, ঢালাই বাবদ, একটু থামবেন, তারপর এমন একটা অঙ্ক বলবেন, শোনামাত্রই শুয়ে পড়তে হবে।

ফটিকবাবু বললেন, 'আপনার কাছেই যাচ্ছি। আজ কিছু দেবেন তো? কিছুটা ক্লিয়ার করুন। আর কতদিন ফেলে রাখবেন?'

একগাল হেসে বললুম, 'যান, বাড়িতে যান না। এখন থেকে সবই আমার স্ত্রী দেখছেন।'

ফটিকবাবু নাচতে নাচতে চলে গেলেন। দু কদম এগোতে না এগোতেই, প্যাটেলের ছেলে। জানলা, দরজা, ফ্রেম, এইসব সাপ্লাই করেছিল। কত দেওয়া হয়েছে, আর কত যে পাবে, আমার কোনও ধারণা নেই। তাকেও হাসিমুখে বাড়িমুখো করে দিলুম।

বাজার প্রায় এসে গেছে। শীতের মুখ, মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি টাটকা কপি, নতুন আলু, গলদা চিংড়ি। বুকপকেটে ময়লা একটা দশটাকার নোটমাত্র সম্বল। হাতে বিশাল এক ব্যাগ। প্রথমে কিছু ইটপাটকেল ভরব। তারপর একবিলো আলু, একফালি কুমড়ো, দু বান্ডিল নটেশাক কিনে, একজোড়া ফুল কপি হাত দিয়ে ধরব। ধরে আদর করে ছেড়ে দেব। তারপর মাছের বাজার গিয়ে একটা বড়সড় মাছের খুব কাছে গিয়ে, ফিসফিস করে বলব, 'অহো কি সুন্দর।' তারপর তার চিকন শরীরে একটু দীর্ঘশ্বাস মাখিয়ে ফিরে আসব। আসার পথে পঞ্চাশগ্রাম কাঁচালঙ্কা কিনবো। কিনবো টাকায় ছটা পাতি লেবু।

সব শেষ করে বাড়িমুখো হতে গিয়েও থেমে পড়লুম। বাড়িতে তো এখন যাওয়া যাবে না। সেখানে তো চলেছে পাওনাদারদের দক্ষযজ্ঞ। ঘুপচি মতো একটা চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ চায়ের হুকুম দিলুম। অনেকক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরাবার সুযোগ হল। যখন তখন ফুসফাস সিগারেট খাবার মতো সঙ্গতি আর নেই। ভালো বাসা মোরে ভিকিরি করেছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে কাপটা সবে নামিয়েছি, দোকানদারকে পয়সা দিতে দিতে মোটামতো শ্যামবর্ণ এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'বিশ্বনাথবাবুর বাড়িটা কোথায়?'

'কে বিশ্বনাথ?' দোকানদার যেন বিরক্ত হলেন।

'নতুন বাড়ি করেছেন। এই কাছাকাছি কোথাও।'

আমি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম, 'বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি খুঁজছেন কেন?'

'আপনি চেনেন?'

'কেন খুঁজছেন বলুন?'

'আমি ইনকামট্যাকসের লোক।'

সঙ্গে সঙ্গে দোকানদার বললেন, 'জানেন তো বলে দিন না।'

'আমিই সেই অধম। আমার নাম বিশ্বনাথ বোস।'

ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল অনেকদিনের এক পলাতক আসামীকে ধরে ফেলেছেন।

pathagar.net

'বিশ্বনাথ বোস ? চলুন বাড়ি চলুন। কথা আছে।'

বাড়ির বাইরে তখন সব সার দিয়ে বসে আছে। গ্রিলঅলা, কাঠঅলা, ইট-চুন-সুরকিঅলা, কনট্র্যাকটর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী। মুখে মোনা-লিসার হাসি। ইনকামট্যাক্সের ভদ্রলোককে সামনে খাড়া করে দিয়ে বললুম, 'এই নাও, আর একজন। ইনি আরও বড় পাওনাদার, পাওনাদারদের মহেশ্বর, খোদ ইনকামট্যাক্স। যথাবিহিত সম্মানপুরঃ নিবেদনমিদম।'

আমার স্ত্রী আরও মধুর হেসে বললেন, 'ভালই হয়েছে। এসেছেন। ইনকামের জীবন্ত সব সোর্স এই সামনে লাইন দিয়ে বসে আছেন। আর আমি মা দুর্গা। কেউ আমাকে গ্রিল দিয়েছেন, কেউ দিয়েছেন কাঠ। কেউ দিয়েছেন বাঁশ। কেউ দিয়েছেন চুন-সুরকি। এই আপনার সোর্স। সবাই এখন গলায় গামছা দিয়ে পাক মারছেন। আপনিও মারুন।'

আমার সেই মুহূর্তে মনে পড়ল গানের লাইন—ওই দেখা যায় বাড়ি আমার, চৌদিকে মালঞ্চ নয়, পাওনাদারের বেড়া।

Pathagar.net

শিশু না হলে এই মহাপূজার মহানন্দ পুরোপুরি উপভোগ করা যায় না। আমরা যারা অর্থনীতির দাস, জীবিকার জন্যে কোথাও না কোথাও মাথা বিকিয়ে বসে আছি, তারা টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব করবে না, 'মা তুমি এলে' বলে আনন্দে ঢাকের তালে তালে নৃত্য করবে, নতুন জামাকাপড় পরে। কী যে করা যায়। প্রতি বছর এ এক মহা অশান্তি। 'সংসারী মানুষের সঞ্চয় করা উচিত'—এই উপদেশ শুনতে শুনতে কান পচে গেল। উত্তম উপদেশ, কিন্তু এই বাজারে সঞ্চয় হয় কী করে। এক মহাপুরুষ বলেছিলেন, 'দ্যাখো বৎস, জীবনে তিনটি কাজ কখনও করবে না, এক, মুদিখানায় খাতা রাখবে না। দুই ভাজা জিনিসে আশক্তি না এনে, সেদ্ধ জিনিস খাবার প্রবণতা বাড়াবে। তিন, ঠিক কত টাকা তুমি রোজগার কর নিজের স্ত্রীকে কদাচ জানাবে না।' তিনটি নিষেধই এ কান দিয়ে শুনে ও কান দিয়ে বের করে দিয়েছি। প্রতি মাসেই মুদিখানার খাতা দেখে স্প্রিংয়ের পুতুলের মত লাফিয়ে উঠি। প্রতিজ্ঞা করি দেনা শোধ করে খাতা পুরিয়ে দেবো। সে আর হয় না। আবার মাথা বাড়িয়ে দি মুড়িয়ে দেবার জন্যে। একটি সত্য হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, ধার কখনও শোধ করা যায় না। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। জন্মেই নিতে আরম্ভ

করেছে, বন্ধ করার উপায় নেই। একবার যখন টেনেছি তখন টানা-ছাড়া করতে করতে শেষ ছাড়া ছাড়তে হবে শেষের দিনে। এ মাসের টাকা শোধ করার পর নগদে কেনার মত টাকা থাকে না।

যবে থেকে চাকরি-জীবন শুরু হয়েছে তবে থেকেই শুরু হয়েছে ভাজা। খাচ্ছি ভাজা। হচ্ছি ভাজা ভাজা। ডাল, ভাত, আলুভাজা কোনও রকমে মেরে দিয়ে, ছোটো বাস কী ট্রেনের পেছনে। তা ছাড়া আমাদের মত মধ্যবিত্তের প্রাণের বন্ধু হল অম্বল। পেটে ঢুকে আলুভাজা রেপ-সীড অয়েল ছাড়তে শুরু করল মৃদুমন্দ। অফিস, হাজিরা খাতা, লাল দাগ, তিন দাগে এক সি. এল, গুঁতোগুঁতি ধস্তাধস্তি, চেয়ারে বসেই পয়লা কাপ চা, পেট ফুলে ঢোল, প্রথামত টিফিনে ঝালমুড়ি অথবা ভে-চপ কিম্বা চারখানা ক্ষয়া ক্ষয়া লুচি। রাত দশটা অবধি শান্তি। সকালের আহারে একখণ্ড পাঁপড় ঢোকাতে পারলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়। সিগারেটের অভ্যাস থাকলে সোনায় সোহাগা। রাতে এক জোড়া অ্যান্টাসিড ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন হবে না। ঝট করে আলসারটা কালচার করে ফেলতে পারলেই ইন্টেলেকচুয়াল। কপালের দুপাশে সরে যাওয়া চুল, মাঝে কাঁচাপাকার বাহার। চালসে ধরা চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। মুখে খুঁতখুঁতে সমালোচনা। জাতে ওঠার এই হল জাতীয় সড়ক।

মানুষ যখন দু'মহলা বাড়ির অধিবাসী ছিল বারমহল আর অন্দরমহল, তখন স্ত্রীজাতি থেকে দূরে থাকার অসুবিধে ছিলো না। একালের ফ্ল্যাটে তা সম্ভব নয়। চোখ এড়িয়ে সিনেমা-পত্রিকা দেখারই উপায় নেই, তো আয় গোপন করা। খুব পাকা চোর না হলে নিজের আয় থেকে কিছু চুরি করা যায় না। একালের স্ত্রীরা হলেন শার্লক হোমসের স্ত্রীং সংস্করণ। দৃষ্টি, ঘ্রাণ উভয়ই প্রবল। বিচারবুদ্ধিও প্রবল। কী তোমার চাকরি, বেসিক, ডি. এ, এইচ. এ কত, সব মুখস্থ। পালাবার পথ নেই পাঁচু। তাছাড়া স্ত্রীরা আমাদের অর্ধাঙ্গিনী নন, আমরাই তেনাদের অর্ধাঙ্গ। হাতে হাল ধরিয়ে দুশ্চিন্তার পাল তুলে বসে থাক। বেশি টেন্ডাই মেন্ডাই করেছ কি মরেছ। হালে পানি পাবে না। স্ত্রীরা আমাদের দয়া করে পোষেন বলেই বেঁচে আছি, তা না হলে করে রস মরে বীরখণ্ড হয়ে মায়ের ভোগে চলে যেতে হত। কেরাসিন তেল, র‍্যাশান, ইলেকট্রিক বিল, স্কুলে দিয়ে আসা নিয়ে আসা, মাইনে দেওয়া, রুমাল, জামার বোতামের খবর রাখা, কোথায় 'সেল' দিচ্ছে সন্ধান রেখে দাও মারতে ছোটা। ইলেকট্রিক লাইন মেরামতের জন্যে মিস্ত্রি ধরা, ছাদে জল পড়ছে, আলকাতরা মাখানো চট পাতা। দেবী দশভুজা। অসুরের বুকে ব্যক্যবাণের খোঁচাটি বজায় রেখে, সস্নেহ দৃষ্টিতে

তাকিয়ে আছেন। আমাদের পজিশান আর পোজ ঠিক আছে। অ্যাকসান নেই। বধ হয়েছি, মরিনি। ওদিকে মুদি আর এদিকে স্ত্রী মাথা মুড়িয়ে ছেড়ে দিলে। নিজেদের বিকিয়ে বসে আছি।

শরতের নীল আকাশ, কাশফুলের ছবি, দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের বাদ্যি চোখেও পড়ে না, কানেও ঢোকে না। ছবার হাঁচলে বুঝতে পারি, ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। বেমক্কা কেনাকাটা শুরু হলে বুঝতে পারি এসে গেল পুজো। দেবার মত আনন্দ আর কিছুতে নেই। রঙিন একটি জামা পরে শিশু হাসছে। নতুন জুতো জোড়া বালিশের পাশে রেখে কিশোর ঘুমোতে যাচ্ছে। পেছন থেকে বালা পরা কচি কচি হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে শিশুকন্যা আবদার করছে, এক শিশি কুমকুম। প্রিয়জন শাড়ির আঁচলা মেলে ধরে হাসি হাসি মুখে বলছে, বাঃ খুব সুন্দর হয়েছে। তার যে কী আনন্দ। প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটানো আর ফুল ফোটানো এক জিনিস। তোমরা সবাই হাস, তোমাদের সঙ্গে আমিও হাসি।

প্রবাসী দাদা এই সময়ে সপরিবারে আসবেন। দাদা পিতার সমান। ভাইঝিটা ভারি সুন্দর হয়েছে। বছরে একবারই দেখা হয়। ছিল এতটুকু। দেখতে দেখতে মহিলা। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। মুখে অমলিন হাসি। ধীর স্থির মৃদুভাষী। লেখাপড়ায় কৃতী। বাবা নিজে পছন্দ করে বউদিকে এনেছিলেন। তাঁর পছন্দের তারিফ করতে হয়। প্রবাসী বলেই বাঙলার পুজোয় এত টান। রোজ অঞ্জলি দিতে পাড়ার পুজো প্যাণ্ডেলে ছুটবে। স্নান-পবিত্র মূর্তি। ফিরে আসবে কপালে এতখানি একটা সিঁদুরের টিপ নিয়ে। তখন মনে হবে দেবী তুমি প্যাণ্ডেলে অনড় প্রতিমা, না গৃহে সচলা। কোমরে আঁচল জড়িয়ে লেগে যাবে রান্নাঘরে। কত রকমের রান্নাই যে জানে। খুশির রান্না আর কর্তব্যের রান্নায় অনেক পার্থক্য। দিন দশেকের জন্যে যৌথ পরিবারের প্রাচীন সুখ ফিরে আসবে। বাবার কথা, মায়ের কথা, ছোট বোনটার কথা মনে পড়বে। তাঁরা ছিলেন, ছিন্নভিন্ন আমাদের রেখে চলে গেছেন। দাদার বাজারের শখ। রোজ সকালে আমার সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরবে। ধোপ দুরস্ত পাজামা পাঞ্জাবি পরে। যেতে যেতে পুরনো মানুষদের খবর নেবে। তাঁরা কেউ আছেন। কেউ নেই। নতুন নতুন সব বাড়ি উঠেছে। নতুন মুখ, নতুন জীবন। যা কিছু পুরনো, ধীরে ধীরে সব হারিয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন বসতবাড়ির হাতবদল হচ্ছে। নতুন, ধনী মানুষেরা নতুন মূল্যবোধের পতাকা ওড়াচ্ছে। স্বজাতি হয়েও তাঁরা যেন বিজাতি। তাঁদের চলন-বলন, ভাব-ভাবনা, আমোদ-প্রমোদ সবই ভিন্ন ধরনের।

বাজারে নতুন ফুলকপি উঠেছে। কাঁচ পালং। নতুন মুলো। মাছের বাজারে অতীত প্রাচুর্য নেই। পুরনো আমলের, শান্ত মেজাজের বেপারিরা নেই। রাগী ছোকরারা বসে আছে। তারা হাসে না। কথা কম বলে। মাঝে মাঝে ধমকায়।

খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতেই শীতের মুখের ছোট বেলা শেষ হয়ে আসবে। দিনান্তের ক্লান্ত পাখি অলস ডানা ঝাড়বে। বারান্দার ইজি চেয়ারে দাদা পুজো-সংখ্যা খুলে বসবেন। জিজ্ঞেস করবেন, বল কার লেখাটা আগে ধরব। দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসবে ঢাকের শব্দ। মাইকের গান। ভাইঝি একপাশে দাঁড়িয়ে চুল শুকোবে। বউদি আসবে পান চিবোতে চিবোতে। তখন একটি কথাই মনে আসবে, মা আমাদের জন্যে অতীতকে ফিরিয়ে আনেন। আনেন ক্ষণ-মিলন সুখ।

পুজো সংখ্যা কোলের ওপর খোলাই পড়ে থাকে। অতীতের কথা হতে থাকে। মা কী রকম ঘুগনি করতেন। কে সবার আগে বিজয়া করতে আসত। লক্ষ্মীপুজোর চন্দ্রপুলী। তালের ফোঁপল কাটা কী কষ্টকর। সিদ্ধি খেয়ে আমরা একবার কী করেছিলাম। দশমীর দিন আমাদের কুকুরটা মারা গিয়েছিল। বউদি বসে থাকবে পা মুড়ে। দেখতে দেখতে সূর্য নেমে আসবে আরও নিচে। দাদার মুখের বাঁ পাশে নিস্তেজ রোদের রেখা পড়বে। উত্তর থেকে বয়ে আসবে শীত শীত বাতাস। দূর আকাশের দিকে তাকালে মনে হবে ঝাঁক ঝাঁক সাদা পাখির মত শীত আসছে পাহাড়ের আশ্রয় থেকে উড়ে উড়ে। আকাশপ্রদীপ আকাশ ছোঁবে। দীপাবলীর মালা পরবে শহর। দুর্গা হবেন শ্যামা। ত্বকে শীতের টান ধরবে। জল ঢাললে গা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করবে। রোদ হয়ে উঠবে কমলা লেবুর মত মিষ্টি। দিনের আলো নিবে গেলে দীপমালায় সেজে উঠবে শহর। তারার আকাশে এক ফালি কুমড়োর মত লেগে থাকবে সপ্তমীর চাঁদ। মেয়েদের সাজগোজ শুরু হবে। এই কটা দিন মনেই হবে না আমরা হা-অন্ন নিরন্নের দেশে বাস করছি। চারপাশে রং, শুধু রং। দুঃখের মুখে সুখের প্রলেপ।

ঝগড়া ঝাঁটি, মামলা-মকর্দমা সবই আপাতত স্থগিত। র‍্যাশানের দোকানের সামনে বিশাল লাইন, কেরসিনের জন্যে টিনবাদ্য সবই মনে হবে মধুর। ঢালাও উৎসবে সব তিক্ততাই সহনীয় হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে শোনা যাবে, রবীন্দ্র সংগীত, হিন্দি ফিলমি গান আর ঢাকের বাদ্যি। যত রাত বাড়বে, তত লোক বাড়বে পথে। জঞ্জাল, আবর্জনা, খানাখন্দ যেমন আছে যেভাবে আছে থাক

পড়ে। পায়ে পায়ে শুধু চলা। নতুন জুতো ফোস্কা ফেলেছে, সেও আনন্দের। রাজনীতির থাবা আপাতত শিথিল, বিদ্যুতের মুষ্ঠিভিক্ষা এই কটি দিনের জন্যে ধনবানের দানসাগর। তামসিক নিদ্রা চোখের আসন ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। ভাঙা চোরা সব মুখই আলোয় উজ্জ্বল। মণ্ডপে মণ্ডপে মাটির প্রতিমা সত্যিই জীবন্ত হয়ে উঠছেন। দুটি চোখে তাঁর বিদ্যুৎ। পদতলে অসুর প্রকৃতই কাতর। এই আনন্দের দিনেও শ্মশান কিন্তু খালি যাবে না। মৃত্যুর ছুটি নেই। চিতায় উঠবে এক বধূ অথবা কোনও এক শিশু। জীবনের শেষ পুজোর শেষ পোশাকটি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে অগ্নিসমর্পণে। কান্নারও আর সে জোর নেই। দুঃখও তরল হয়ে গেছে। নাতির হাত ধরে বৃদ্ধা এসেছেন প্রতিমা দর্শনে। মনে মনে ভাবছেন, সামনের বার আর কী দর্শন হবে। নাতির প্রশ্ন-বাণে জর্জরিত। থাকার আবেগে না থাকার শূন্যতা ভরে উঠছে। মৃত্যুর সিংহ-দুয়ারে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে শিশু ভোলানাথের কথা। সব দৃষ্টিই মায়ের দিকে। এদিকে কারুর দৃষ্টি থাকলে, জীবনের তিল তিল পরিণতি স্পষ্ট হত। আজ শিশু কালে সেই পরিণত বিদায়ী বৃদ্ধ। এক রাশ ঝরা ফুলের মত পায়ের তলায় পড়ে আছে জীবনের ঝরা দিন।

এই শহরেরই এক প্রান্তে আছেন আমারই এক বৃদ্ধা আত্মীয়া। সাবেককালের নোনাধরা বাড়িতে নিঃসঙ্গ জীবন। এককালে কী বোলবোলাই না ছিল। রূপও ছিল তেমনি। জুড়িগাড়ি চেপে গঙ্গাস্নানে যেতেন। রোজ সকালে আস্ত একটি রুই মাছ পড়ে থাকত রান্নাঘরের রকে। সে মাছের আকার আকৃতি দেখে বেড়ালও থমকে থাকত ভয়ে দূরে। পরিবারের বড় আদরের বধূ ছিলেন তিনি। আভিজাত্য আছে। অর্থ নেই। প্রিয়জনেরা বিদায় নিয়েছেন একে একে। স্মৃতি আছে ছবি হয়ে। কণ্ঠস্বর নেই। পিছনে ফেরে নিজেরই পদশব্দ, বিশ্বস্ত সঙ্গীর মত। বড় আনন্দে রেখেছিলেন বৃদ্ধার স্বামী। নিত্য নতুন শাড়ি পরাতেন। প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াবে এ ঘরে ও ঘরে। বেনারস থেকে জর্দা আনিয়ে দিতেন। কথা বললেই সুন্দর গন্ধ। সেই বাড়ির সব ঘরে এখন আর আলো জ্বলে না। আঁচলের আড়ালে সন্ধ্যার প্রদীপ হাতে বৃদ্ধা ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান। নিজেরই ছায়া কাঁপতে থাকে দীর্ঘ হয়ে দেয়ালে। দুই কৃতী সন্তান বিয়ের পর বউ নিয়ে আলাদা। মাসে মাসে কিছু মাসোহারা পাঠায়। একালে কর্তব্যের নতুন ব্যাখ্যা এই হয়েছে। সেই বৃদ্ধার কাছে ইঞ্চিপাড় একটি শাড়ি আর এক বাক্স মিষ্টি হাতে পুজোর আগে যাওয়া এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নিঃসঙ্গতা, দুঃখ তাঁকে ম্লান করতে পারেনি। কারুর প্রতি কোনও ক্ষোভ নেই,

অভিযোগ নেই। জীবনে সুখের মাত্রা এত বেশি ছিল দুঃখকে দুঃখ বলে মনে হবার আগেই জীবন শেষ হয়ে যাবে।

সন্ধ্যার মুখে তাঁর বাড়িতে যাব। ধ্যানস্থ প্রাচীন বাড়ি। কার্নিসে বটের ঝুরি ঝুলছে। নোনা লেগে খসে পড়েছে দেয়ালের পলস্তারা। মৃদু করাঘাতেই প্রাচীন কপাট উন্মুক্ত হবে। সচল প্রস্তর মূর্তির মত সমানেই সেই বৃদ্ধা। চোখে রুপোর ডাঁটির চশমা। মুখে প্রসন্ন হাসি। জীবিত কোনও মানুষকে দেখার কী আনন্দ। মধ্যবিত্তের কায়ক্লেশ উপার্জনে কেনা সামান্য একটি কাপড়, এক বাক্স মিষ্টি, এমন কোনও মূল্যবান উপহার সামগ্রী নয়। মন দিতে চায় অনেক কিছু, সামর্থ্যে কুলোয় না। তারপর এও ভাবি টাকার অঙ্কে সব আবেগ কি প্রকাশ করা যায়। সমস্ত প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে যিনি চলে গেছেন তাঁর কাছে উপহারের বিচার মূল্যে নয়। সাগ্রহে হাত পেতে নেবেন তিনি। ভাব দেখাবেন ভীষণ খুশি হয়েছেন তিনি। সে শুধু আমার লজ্জা ঢাকার জন্যে। স্নেহ আর আশীর্বাদ ছাড়া আমাকে তাঁর দেবার কিছু নেই। জীবনের বহুমূল্য দুটি জিনিস। অর্থে যা কেনা যায় না। ফিরে আসার সময় চকিতে মনে হবে সামনের বার আর কি দেখা হবে।

দেখতে দেখতে দাদার ছুটির দিন শেষ হয়ে যাবে। শুরু হবে বাঁধাছাঁদা। যেখানে যা ছড়ানো ছেটানো ছিল একে একে সবই উঠে যাবে। দাদা, বউদি, ভাইঝি তিনজনের চোখই ছলছল করবে। গাড়িটি পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। শেষ বাঁক নেবার আগে পর্যন্ত তারা ফিরে ফিরে তাকাবে। বাড়ি একেবারে ফাঁকা। এত ফাঁকা যে চড়াইয়ের কিচকিচ ডাক শোনা যাবে।

হাট ভাঙা সংসারের শূন্য বিছানায় মাঝ রাতে শুয়ে শুয়ে মনের চোখে দেখব, বন-পাহাড়ের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে ট্রেন চলেছে, দূর থেকে দূরে। এ ট্রেন বছরে একবার আসে, একবার যায়। দুপ্রান্তে দুটি স্টেশান। এ-প্রান্তের স্টেশানের নাম প্রিয়জন, ও-প্রান্তের নাম প্রয়োজন।

pathagar.net

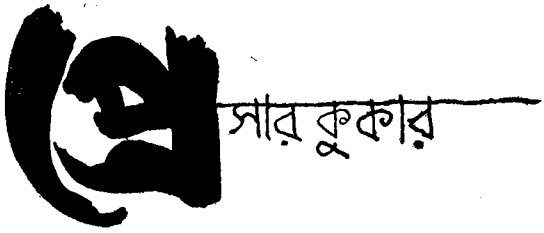

আগেকার দিনে নীলকর সাহেবরা 'বেগার' ধরতে বেরোতেন। সাহেব চলেছেন ঘোড়ায় চেপে। হঠাৎ নজরে পড়ল এক পুরোহিত চলেছেন নামাবলি গায়ে। হাতে শালগ্রাম শিলা। রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়ি ঘোড়া দাঁড় করিয়ে সাহেব বললে, 'পালাইতেছ কোথা, বেগার ডিটে হইবে।' ব্যাস হয়ে গেল। যজমানের বাড়ি পড়ে রইল দু' ক্রোশ দূরে? সত্যনারায়ন মাথায় উঠল। পুরোহিত চললেন, সায়েবের নীল চাষে বেগার খাটতে। না গেলেই সপাসপ চাবুক।

যুগ অনেকদূর সরে এলেও আমার সংসার চলছে বেগারপ্রথায়। আমার স্ত্রী বেশ ভালো কায়দা বের করেছে। মহিলার ক্ষমতা আছে। পূর্ব জন্মে হয় নীলকর সাহেব ছিল, না হয় সায়েবের হারেমের কোনও দেশি বিবি।

আমি একটা গ্রাম-গ্রাম অঞ্চলে থাকি। বাড়ির চারপাশে একটা বাগান মত ব্যাপার আছে। প্রথমদিকে বাগানই ছিল। প্রতিবেশীদের সহৃদয় উৎপাতে সাধের বাগানে এখন নৈরাজ্য চলেছে। কিছু ফুলের গাছ স্ট্যামিনার জোরে এখনও টিঁকে আছে। আর ক'দিন থাকবে বলা শক্ত। বহুকাল নতুন কোন গাছ বসানো হয়নি। এখন পাখিরাই বাগান করছে। ঠোঁটে করে

বীজ এনে ফেলে। অনেক সময় পক্ষীকৃত্যের সঙ্গে দুচারটে বদহজমের মাল বেরিয়ে আসে। জমির স্বাভাবিক ধর্মে দু' একটি নতুন গাছ গজিয়ে ওঠে। ওইভাবে বেশ ঝাঁকড়া একটি ফলসা গাছ হয়েছে। মোরগ ফুল হয়েছে। একটা জামগাছ হয়েছে। জাম মনে হয় পাখিতে করেনি। কোনও লিভারঅলা কুকুরেও করতে পারে অথবা হনুমানে।

সে যাই হোক। এবার মহিলার একটু বর্ণনা দেওয়া যাক। কারণ, এই কাহিনীর তিনিই হলেন নায়িকা। একথা বলা চলে, একটু চেষ্টা করলে তিনি নির্বাচনে জিতে সহজেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতে পারতেন। আর হলে, আমাদের দেশের হাসপাতালে এই অব্যবস্থা চলতে পারত না। চাবুকে ঠাণ্ডা করে দিতেন। দেশের দুর্ভাগ্য এমন একটি প্রতিভা গৃহকূপে ছাই চাপা হয়ে আছে।

চেহারায় বেশ একটা কম্যাণ্ডার কম্যাণ্ডার ভাব আছে। হিটলার বেঁচে থাকলে ধরে নিয়ে গিয়ে মহিলা গেস্টাপো করে রাইনল্যাণ্ডে ছেড়ে দিতেন। এনার সমস্ত কথাবার্তাই যেন মিলিটারি কম্যাণ্ডের মত। অ্যায় বললে জগৎ থমকে দাঁড়ায়। দেয়াল ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়, এ আমার নিজের দেখা। টুলে উঠে পেণ্ডুলাম ঠেলতে হয়। রেডিওর গান থেমে যায়। শিল্পী বলে ওঠেন একটু আস্তে ম্যাডাম। আমি স্পষ্ট শুনেছি। প্রথমদিকে আমার সঙ্গে মাঝরাতে যখন দুচারটে প্রেমের কথা হত, পরের দিন সকালে প্রতিবেশীরা আমাকে দেখে মুচকি মুচকি হাসতেন। কেন হাসছেন, বুঝতে পারতুম না। একদিন পাশের বাড়ির রসিক বউদি বললেন, কি ঠাকুরপো কাল নুকিয়ে নুকিয়ে খুব কাটলেট খাওয়া হয়েছিল?

কি করে বুঝলেন?

রাত আড়াইটের সময় ঘুম ভেঙে গেল শুনলাম, আপনার স্ত্রী বলছেন, সরে শোও, তোমার মুখে ভক ভক করছে পেঁয়াজের গন্ধ। এবার থেকে বাইরে কিছু খেলে, একটা করে বড় এলাচ খাবেন। পেঁয়াজের মুখে হাম খেলে প্রেম কেঁচে যায়। জর্দা দিয়ে পানও খেতে পারেন। প্রেমিকরা প্রাণের দায়ে সহ্য করলেও, স্ত্রীদের করা উচিত নয়।

সেইদিন বুঝেছিলুম, জীবনের অনেক কথাই গলার গুনে লিক করে বসে আছে। একদিন মাঝরাতে ভীষণ মেঘ করে ঝোড়ো বাতাস বইছিল। ওঠো-ওঠো ঝড় উঠেছে বলে কম্বুকণ্ঠে এমন একটি হাঁক ছাড়লেন, যেন কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ম্যাডাম কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য বাজাচ্ছেন। সারা জনপদ জেগে উঠে চিৎকার করতে লাগল

কি হয়েছে, কি হয়েছে? 'জানালা বন্ধ করে পাখাটা খুলে দাও' বলে তিনি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন।

এ সবই তাঁর চরিত্রের গুণ। ঈশ্বর বেশ বড়সড় কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন প্রোডাকসান লাইন থেকে মাল হাত ফসকে বেরিয়ে এসেছে। বাড়িতে একবার চোর পড়েছিল। চোরের আর দোষ কি। অসময়ে বাড়ি বাড়ি ঢোকাই তার ব্যবসা।

চোর দিয়েই শুরু করা যাক।

চোরেদের নিয়ম হল, চুরি করার আগে বাড়ির চৌহদ্দিতে একটু বড় বাইরে করা। ঠিকমত হলে বুঝতে হবে নার্ভ ঠিক আছে। এইবার পাইপ বেয়ে ওঠো, কি তালা ভাঙো অথবা গ্রিল ওপড়াও। হাত-পা কাঁপবে না, দিল হেলবে না। নিজের ওপর নিজের কনস্ট্রোল।

আমার স্বভাব হল জেগে আছি তো বেশ আছি। একবার শুয়ে পড়লে মড়া। তখন জাগাতে হলে ঢাক ঢোল বাজাতে হবে। কিংবা ঠ্যাং ধরে খাট থেকে ফেলে দিতে হবে। কখন চোর ঢুকেছে জানি না। কিভাবে ঢুকেছে তাও জানি না। শুনেছি খোলা জানালা দিয়ে চোরেরা প্রথম গাঁজাপক্ক বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে। তাতে গেরস্থর ঘুম বেশ পেকে ওঠে। তার মানে আমার পাকা ঘুম আরও পাকা হয়েছিল।

আমার যখন ঘুম ভাঙল, চোর তখন মহিলার খপ্পরে। আমাদের একটা বাঘাকুকুর আছে। তার হাঁক ডাকও পালিকার কনট্রোলে। যখন ডাকের দরকার নেই, তখন তাকে ঘুমের বড়ি খাওয়ানো হয়। বাঘা তখন হাত-পা ছড়িয়ে ভোঁস ভোঁস ঘুমোয়। নেশা কেটে গেলে ওঠে, উঠে ভুক্ ভুক্ ডাক ছাড়ে। তখন তার জন্যে বিস্কুট আসে, দুধ আসে। তার খাতিরই আলাদা। সংসারে তার যত্ন আমার চেয়েও বেশি। হিংসে হয়। হলে কি করব। সে কুকুর। পেয়ারের কুকুর। আমি মানুষ। হতচ্ছেদ্দার স্বামী। না মরলে আমার কদর হবে না। মরে যেদিন ছবি হয়ে ঝুলব, সেইদিনই হয়তো প্রাপ্য সম্মান পাব। দু ফোঁটা অশ্রুজল। তখন আমি গাইব, জীবনে যারে তুমি দাওনি চা-বিস্কুট, মরণে কেন তারে দিতে এলে মণ্ড মারা ধূপ। শুনতে পাবে না। না শোনাই ভালো! শুনলেই তেড়েফুঁড়ে উঠবে, কি বললে? ভুলেই যাবে আমি মরে ভূত হয়েছি।

না, অন্য প্রসঙ্গে সরে যাচ্ছি। এসব হল পুরুষ মানুষের অভিমানের কথা। পুরুষ বললে প্রতিবাদের ঝড় বইবে। এ হল খোকাপুরুষ। কুকুরের কথায় ফিরে আসা যাক। কুকুর এমন ট্রেনিং পেয়েছে, আমাকেও ধমকায়। মহিলার

ওপর হয়তো একটু হম্বিতম্বি করে ফেলেছি, কুকুর অমনি প্রতিপক্ষের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গড়ড়ড় গড়ড়ড় করে জানান দিলে, বেশি বাড়াবাড়ি করেছ কি, খ্যাঁক। আধপো মাংস নিয়ে নেমে যাব। সেই সময় স্ত্রী যদি আমার মাথার পেছনে সোহাগের হাত না রাখে, সারাদিন আমাকে এক জায়গায় স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। নড়াচড়া করলেই কুকুর গড়গড় করবে। আচ্ছা দাওয়াই পাকড়েছে যা হোক। দাম্পত্য কলহের পরিণতি, আমার করুণ মিনতি, ওগো আর করব না, এই নজরবন্দী অবস্থা থেকে আমাকে মুক্ত করো, মুক্ত করো এলোকেশী, ভবে যন্ত্রনা পাই দিবানিশি।

কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার নানারকম ব্যবস্থা ছিল। কুকুরের ঘুম ভাঙাবার ব্যবস্থা খুব সহজ। নাকের কালো অংশে একটু কাঁচা লঙ্কার রস। সেই পদ্ধতিতেই কুকুরকে জাগান হয়েছে। চোর ঢুকেছিল খাবার ঘরে। বাসন-কোসনের লোভে। বাইরে থেকে শেকল তুলে তাকে বন্দী করা হয়েছে। জানালা দিয়ে কথাবার্তা চলছে মহিলা হাতে একটা খেঁটে লাঠি নিয়ে জানালার বাইরে। চোর ঘরের মেঝেতে উবু। বাঘা সামনের দুটো পা জানালার গ্রিলে তুলে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। এবার কি হবে বাছাধন। চোর আমাদের পরিচিত। তার নাম সোনা। সোনার চাঁদ ছেলে। সকালে খুব টেরি বাগিয়ে ঘোরে।

সেই চোর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নাকখত দিতে দিতে। কোমরে দড়ি বাঁধা হল। এমন বুদ্ধি আমার মাথায় আসত না। মহিলা বললেন, বল কোথায় কি করেছিস ?

কেঁদে বললে, পাতকোতলায় ?

সেই মাল নিজে হাত তুলে পরিষ্কার করতে হল। তারপর ঝাঁটা আর ফিনাইল। ভোর হয়ে এল। নিস্কৃতি পাওয়া অত সহজ নয়। বেলা বারোটা অবধি চোর বাঁধা রইল বারান্দার থামে, বাঘার পাহারায়। জনে জনে আসে আর দ্যাখে। ওমা ! এ যে আমাদের সোনা।

মহিলা সোনাকে একটি সাইকেল রিকশা কিনে দিয়েছেন। সোনা এখন রিক্সা চালায়। রোজ তিন টাকা জমা দিয়ে যায়। আর মালকানকে হিঁয়া হুঁয়া ঘোরায়। সে বেচারা চোর থেকে সাধু হয়ে বেগার খেটে মরে। বেলা দেড়টার সময় কটকটে রোদে লাইন দিয়ে ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট কেটে এনে মহিলা দারোগাকে সন্তুষ্ট রাখে। যিনি সোনার মত পাকা চোরকে কলুর বলদের মত নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারেন, তাঁর যে অসীম ক্ষমতা এ-কথা রাষ্ট্রপতিও মানবেন।

একবার হাত খুলে গেলে তাকে আর পায় কে।

ফুলগাছের কিছু অংশ পাঁচিলের বাইরে যাবেই। রাজা ক্যানিউটও শাসনে রাখতে পারবেন না। ভোরের দিকে সাজি হাতে বাচ্চা একটি মেয়ে, সবে একটা ডাল ধরে টান মেরেছে, মালকান পাঁচিলের এপাশ থেকে আদুরে গলায় বললেন, কি রে ফুল নিবি বুঝি?

আদরে গলে গিয়ে মেয়েটি বললে, হ্যাঁ মাসীমা।

আয় ভেতরে আয়।

আমি ভাবছি, বাবা, শরীরে বাতের মত হঠাৎ এত দয়া হলো কোথা থেকে। গাঁটে গাঁটে দয়া। মুখে টুথ ব্রাস। সান্টাক্লুজের গোঁফের মত চারপাশে পেস্টের ফেনা। মেয়েটি হাসিমুখে দাঁড়াল। ফুল চুরি করতে গিয়ে এমন অভ্যর্থনা সে কোথাও পায়নি।

দে, সাজিটা দে। মহিলা বাঁ হাতে সাজিটা নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন এক কুলো র‍্যাশনের চাল নিয়ে।

আয়, এই রকে বোস।

মেয়েটি অবাক হয়ে বললে, বোসবো কেন মাসীমা? আপনি যে বললেন, ফুল দেবেন, চাল দিচ্ছেন কেন?

চাল দেবো কেন। চাল ক'টা এখানে বসে বেছে দে। তার পর ফুল পাবি।

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো মুখে বললে আমার ফুল চাই না মাসীমা। সাজিটা ফেরৎ দিন।

মাসীমা উত্তরে চ্যাপ, বলে অ্যায়সা এক ধমক দিলেন। বোস এখানে, চাল বাছ, তবে সাজি পাবি।

বেচারার কি গেরো। খোল নলচে দুই-ই গেল। করুণ মুখ দেখে আমি একটু সালিশি করতে গিয়ে এক ধমক খেলুম, তুমি চুপ করো। তোমার চরকায় তেল দাও, আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।

মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ মিহি সুরে বললেন, কতক্ষণ আর লাগবে, টুকটুক করে বেছে ফেল, এক সাজি ফুল পাবি।

ঘণ্টাখানেক লাগল সেই চাল বাছতে। তারপর হুকুম হল, নে, সব গাছে উঠে এক সাজি ফুল পাড়। সেই ফুল তিন ভাগ কর। এক ভাগ আমার, এক ভাগ তোর, আর এক ভাগ কালী বাড়ীতে দিয়ে আসবি।

কালীবাড়ী যে অনেক দূরে মাসীমা। দেরি হয়ে যাবে। আমার মা বকবে।

চুপ। একটা কথা নয়। যা বলছি তাই শুনবি। তা না হলে সাজি

কেড়ে রেখে দোব, কুকুর লেলিয়ে দোব। পাঁচিলের বাইরে লকলক করে দুলছে ফুলগাছের ডাল। বড়ই লোভনীয়। তবে হাত দিয়েছ কি মরেছ। এক-একটি অক্টোপাশের শুঁড়। ভোরের বাগানে অক্টোপাশ চটি পায়ে ঘুরছেন। মুখে টুথ ব্রাশ। ডাল ধরে কেউ না কেউ টানবেই আর সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে যাবে অক্টোপাসের জালে। বাছো এক কুলো চাল, তবেই মিলবে একমুঠো ফুল, নয় তো সাজিটাও যাবে।

আমাদের বাড়িতে তিন-চারটে জলের কল। একটা কল কুয়োতলায়। সেখানে দুটো চৌবাচ্চা। একটা বিরাট আর একটা মাঝারি। লোডশেডিং-এর পর প্রথম যে জল আসে সেটা টালার মিষ্টি জল। মিনিট পনের থাকে। তারপরেই আসে ডিপ-টিউবওয়েলের কষা জল। এই মিষ্টি জল নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বালতি, ডেকচি, গামলা নিয়ে যত কুঁচো-কাঁচা ঢুকে পড়ে বাড়িতে।

এই জল হল বেগার ধরার ফাঁদ। দৃশ্যটি বড়ই মনোরম। ফাঁদে এক সঙ্গে এত শিকার? মাকড়সার প্রাণ নেচে ওঠে। খেল শুরু হয় বালতি ভরে ওঠার পর। জল টলটলে বালতিটি তুলে নিয়ে সরে পড়ার তালে ছিল একটি কিশোর। ঘাড়ে যেন বাঘ পড়ল।

জগো, বালতি রাখ। চৌবাচ্চা দুটোর ফুটো খুলে সব জল বের করে দে।

জগো ভাবলে, বাঃ, এ বেশ খেলা! কলকল জল বেরচ্ছে। চৌবাচ্চা খালি হচ্ছে। জানা ছিল না ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে। এই এতখানি একটা বুরুশ হাতে মালকান এসে সামনে দাঁড়ালেন, কোমর বেঁধে, নে, এইবার ঘষে ঘষে ভেতরের শ্যাওলা পরিষ্কার কর।

জগোর চক্ষু চড়কগাছ, ও ঠাম্মা, এ আমি পারব না।

তোর ঘাড় পারবে। জল নেবার সময় মনে থাকে না। পরিষ্কার করলে তবেই জলের বালতি নিয়ে যেতে দোব।

এক ঘণ্টা লাগল জগোর চৌবাচ্চা সাফ করতে। তাতেও নিষ্কৃতি নেই। হুকুম হল, ভাল করে ফুটো বন্ধ করে পাইপ লাগা। চৌবাচ্চায় পাইপ লাগাবে কি, ঘষে ঘষে জগোর নড়া ছিঁড়ে গেছে। তার নাকে অকসিজেনের নল গুঁজতে পারলে ভাল হয়। জগোর সঙ্গে জল নিতে এসে ফাঁদে পড়েছে উমা। সে আর একপাশে চিঁচিঁ করছে। বাজার থেকে চুনো মাছ এনেছিলুম। বঁটি, ছাই আর চুনো মাছ নিয়ে সে বসে আছে ছলছলে চোখে। ওই মাছ শেষ করে উঠলে তবে সে জলের গামলা তুলে নেবার ছাড়পত্র পাবে।

সামনের রাস্তা দিয়ে সনাতন চলেছে নেচে নেচে। এই শোন্, কোথায় যাচ্ছিস ?

পাশের একটা ছোট কারখানায় সনাতন কাজ করে। কারখানার কি একটা কিনতে বাজারে ছুটছিল। হাতে লোহালক্কড়। ছেলেটা সব সময় হাসে। হাসতে হাসতে পাঁচিলের পাশে এসে বললে, বাজারে যাচ্ছি মাসীমা।

তোর ওই সব লোহালক্কড় রাখ এখানে।

কেন মাসীমা ?

এই নে কেরোসিনের টিন আর টাকা। ওদের দোকানে তেল দিচ্ছে। এনে দে পাঁচ লিটার।

আমি কারখানার কাজে যাচ্ছি যে।

গোলি মার তোর কাজে। এক ফোঁটা তেল নেই বাড়িতে। আমার কি অন্ধকারে থাকব।

বিরাট লাইন মাসীমা। আমি পরে এনে দোব।

হ্যাঁ, তেল তোমার জন্যে বসে থাকবে।

এখন আমি পারব না।

ঠিক আছে মনে থাকে যেন! আজ বাদ কাল শনিবার, তুমি টিভি দেখতে এসো। সরস্বতী পুজোর সময় লাইটের কানেকসান চেয়ো। তখন ভাল করে দোব।

কুইনিন খাবার মত মুখ করে সনাতন ছুটলো তেল আনতে ?

ইতিমধ্যে গৌর পালাচ্ছিল পাশ দিয়ে। সেও ফাঁদে পড়ে গেল। তার ঘাড়ে চাপল র‍্যাশান। গুইগাঁই করছিল। যেই শুনলে, আমাদের ছেড়ে-দেওয়া পামতেল ভবিষ্যতে আর পাবে না, ঘাড় হেঁট করে ছুটল র‍্যাশান তুলতে। মাঝে মাঝে আমরা চাল গম আর তেল ছেড়ে দি! গৌরের মা সেইসব পায়। গৌরের টিকি তাই মহিলার হাতে। টানলেই মাথা চলে আসে।

দাদারও দাদা আছে। এমন চেলা আছে যে গরুকে চা বাগানে বেচে দিয়ে আসতে পারে। ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করছি মহিলার দাপট যেন একটু কমে এসেছে। সামান্য উদাস উদাস ভাব। মাঝে মাঝেই পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। গলা তুলে তুলে কাকে যেন খুঁজছেন। যৌবন উতরে গেল, এ বয়েস তো প্রেমে পড়ার নয়। বলা যায় না, পরকীয়া কখন কিভাবে এসে পড়ে। যদি আসে মন্দ হয় না। কেউ ইলোপ করে নিয়ে চলে যায়, দিনকতক একটু শান্তিতে থাকা যায়।

পাঁচিলের কাছ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে আসছেন, মুখে চুকচুক শব্দ। একেবারে আমার মুখোমুখি!

কি হল ম্যাডাম?

থাক আর রসিকতা করতে হবে না। আমার বলে নিজের ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা!

কেন, কি হল?

সনাতনকে ক'দিন হল দেখতে পাচ্ছি না।

তেল ফুরিয়েছে বুঝি।

তেল ফুরোলে ত বুঝতুম, আমাদের প্রেসার কুকারটা সারিয়ে আনতে বলেছিলুম! সেই যে নিয়ে গেল, আজ সাতদিন হয়ে গেল টিকির দেখা নেই। এদিকে একটা গুজব শুনছি, সত্যি-মিথ্যে জানি না।

কি গুজোব? ছেলেধরার!

আরে ধুর, ও দামড়াকে কে ধরবে! শুনছি, ওই নাকি একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে পালিয়েছে।

সে কি গো, একটা প্রেসার কুকারের যে এখন অনেক দাম।

তাই তো রাগে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। তুমিও একটু সন্ধান করো না। ধরতে পারলে বাপের নাম ভুলিয়ে দোব।

এ পাড়ার দুজন মানুষ এখন হন্যে হয়ে দুটো জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছে। একজন তালাশ করেছেন তাঁর একমাত্র মেয়ের! আর একজন সন্ধান করছেন প্রেসার কুকারের। সংসার বড় মিইয়ে পড়েছে। জোড়া হিস্ না হলে তেমন জমে না। প্রেসারেরও মেল-ফিমেল আছে। মেলটা গেছে, ফিমেল তাই বড় মন-মরা। এই বিরহে আমি কিন্তু বড় মধুর আছি।

pathagar.net

২ নুমান

আমাদের পাড়ায় এখনও কিছু গাছপালা আছে। আর কতদিন থাকবে জানি না। পিলপিল করে মানুষ বাড়ছে। যেখানে যত পুকুর আর জলা জমি ছিল সব ভরাট করে বাড়ির পর বাড়ি উঠছে। তাতেও বাসস্থানের অভাব ঘুচছে না। এই পল্লীর কিছু দূরেই দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ছিল বিশাল বাগান। বিখ্যাত পঞ্চবটি। যুগ পালটে গেল। সে যুগে পঞ্চবটিতে সাধনা হত। এ যুগেও সাধনা হয়, প্রেমের সাধনা। ক্রমশ বাগানটি বড়ই বিপজ্জনক হয়ে পড়ায় এখন কেটেকুটে ফর্সা করে দেওয়া হয়েছে। সাধনার আর প্রয়োজন নেই। পঞ্চবটিতে বসবাস করত অসংখ্য হনুমান। তাদেরই দু'এক জোড়া বেড়াতে আসত আমাদের পাড়ায়।

সে এক দৃশ্য! নিমেষে সব ওলটপালট। তাদের মধ্যে প্রবেশটা ছিল এইরকম, বীর আর বীরের ওয়াইফ জেড়ে লাফিয়ে এসে পড়ল অক্ষয়বাবুর টালির ছাদে। যেখানে পড়ল সে জায়গার সব টালি চুরমার। মার মার করে তেড়ে এলেন অক্ষয়বাবু সপরিবারে। বীর হনুমান দাঁত খিচিয়ে তেড়ে গেল। বীর অক্ষয়বাবুর পরিবার বললেন, 'আ-মরণ, তেড়ে তেড়ে আসছে, তেড়ে তেড়ে আসছে। এক একটা টালির দাম দশ টাকা, মুখ পোড়া কুড়িটা টালি ভেঙে

দিলে গা।' টালির চালে বীর তাল ঠুকছে, নিচে সপরিবারে অক্ষয়বাবুর পরিবার। বড় ছেলে আধলা একটা ইট ছুঁড়লে। ইট গিয়ে লাগল ভূতনাথ-বাবুর সিঁড়ির বাহারি কাঁচে। বীর এইবার ঝাঁপ মারল পাশের বাড়ির পেঁপে গাছে। দুটো গাছের মাথা ভেঙে অর্ধনমিত পাতাকার মতো ফলন্ত পেঁপে সমেত ঝুলে গেল। সেই বাড়িতে হাহাকার উঠল। সেদিক থেকে ছুটে এল ঝাঁক ঝাঁক ঢিল। রাস্তা দিয়ে সনাতনবাবু যাচ্ছিলেন নস্যি নিতে নিতে, তাঁর টাক ফেটে গেল। হনুমান গিয়ে বসল তারকবাবুর কলমের পেয়ারা গাছে। পাড়ার বালখিল্যরা সবাই রণাঙ্গনে নেমে পড়েছে। চিৎকার, চেঁচামেচি, হইহই। দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। হনুমানযুগলে আপনমনে পেয়ারা ধ্বংস করে চলেছে। ওদিকে অক্ষয়বাবু আর ভূতনাথবাবুর পরিবারে লাঠালাঠি বেঁধে গেছে। সনাতনবাবুর টাকে আইডিন ভেজান এক থাবা তুলো চেপে ধরেছে সোস্যাল ওয়ার্কার যমুনা।

হনুমান এইবার এক লাফ মেরে ভণ্ডুলদের ছাদের এক জোড়া টিভি এণ্টেনা ধরাশায়ী করে বীর দর্পে তিনবার হুপ শব্দ ছেড়ে ইংরিজি স্কুলের বিরাট অর্জুন গাছের মগডালে গিয়ে চড়ে বসল। ভাল মানুষের মতো মুখ, যেন কিছুই জানে না। একজোড়া লেজ ঝুলছে। এক ঝাঁক কাক কা কা করছে। এক পাল কুকুর ঘেউঘেউ করে পাড়া ফাটাচ্ছে। বীরের বউ স্বামীর মাথার উকুন মারছে। তারা যেমন হঠাৎ এসেছিল, সেইরকম হঠাৎ এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল! হনুমানের আগমন, হনুমানের নিষ্ক্রমণ যেন এক পর্ব।

হঠাৎ সেদিন আবার হনুমান এল। ইতিমধ্যে অক্ষয়বাবুর টালির ছাদ পালাই হয়ে গেছে। সুতরাং হইহইটা আর ওই তল্লাটে হল না। হনুমান গুগল আমাদের পাড়ার উঠতি বড়লোক শঙ্করবাবুর বিশাল ছাদে ল্যাণ্ড করে প্রথমে এক রাউণ্ড পায়চারি করে নিল। একটি শিশু দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল, পাশেই তার বাবা, মেঝেতে বসে হাত আয়নায় দাড়ি কামাচ্ছিলেন। সারা মুখে সাবানের ফেনা। ছেলে আদো আদো বুলিতে বললে, 'বাবা হুম্মান।' বাবার চোখ আয়নায়। তিনি ভাবলেন ছেলে কাকেই বলছে। ছেলেকে বললেন, 'ছিঃ, ছিঃ, পেট থেকে পড়তে না পড়তেই বাপকে হুনমান বলছিস বাবা। কালের কী প্রভাব!' ছেলের সে-কথা কানে গেল না, সে আরও চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওই যে হুম্মায়।'

ছেলের মা বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। সামনের বাড়ির ছাদের আলসেতে হনুমান। তিনি ছেলেকে বললেন 'নমো করো, নমো করো।' স্বামীকে বললেন,

'দাড়ি পাঁচ মিনিট পরে কামালেও চলবে। গেট আপ, গেট আপ, আগে নমস্কার করো।'

একগালে সাবান, স্বামী উঠে দাঁড়ালেন। একালের স্বামীরা স্ত্রীর বশীভূত। প্রশ্ন করলেন না, কেন নমো করব! এক বছর আগে তো পাটকেল মারা হত। পাল্লা দিয়ে দাঁত খিঁচনো হত। ছড়া কাটা হত, 'এই হনুমান কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি? বড় বউয়ের বাবা হবি?' হঠাৎ কেন এই ভাবান্তর! কোনও দিক থেকেই ইট পাটকেল এসে পড়ছে না। ছেলেরা হই হই করছে না। কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে না। ব্যাপারটা কী?

সামনের বাড়ির ছাদে এক মহিলার আবির্ভাব হল। তার হাতে এক ডজন সিঙ্গাপুরী কলার পুরুষ্টু এক ছড়া। তিনি সসম্ভ্রমে নতজানু হয়ে ছড়াটি সেই বীর হনুমানকে নিবেদন করলেন। এক লাফে এগিয়ে এসে কলার ছড়া নিয়ে হনুমান উঠে গেল চিলের ছাদে। সেখানে আয়েস করে বসে একটি একটি করে কলা খেয়ে খোসাগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিচে ফেলতে লাগল।

দেখা গেল শুধু ওই বাড়ি নয় আশেপাশের সব বাড়ির ছাদেই মেয়েরা উঠে পড়েছেন। যুবতী মেয়ের সংখ্যাই বেশি। হনুমানকে ভোগ নিবেদনের প্রতিযোগিতা পড়ে গেল। কারুর হাতে ফুলকপি। কারুর হাতে বাঁধাকপি, কারুর হাতে মুলো। কেউ এনেছেন এক চুবড়ি সিম। যাঁর হাতের কাছে কিছুই ছিল না, তিনি এনেছেন আলু। কেউ রোগীর মাথার কাছ থেকে টেনে এনেছেন আপেল আর কমলালেবু। হনুমান লাফিয়ে লাফিয়ে ছাদে ছাদে ঘুরছে আর খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে। একজন কিছু না পেয়ে আস্ত একটা মানকচু দিয়েছিল। হনুমান তাইতে এক কামড় মেরেই দাতাকে সপাটে এক চড়।

হনুমান শেষ একটা কেক খেয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। ভদ্রলোক বাকি আধগালের দাড়ি কামাতে কামাতে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার বল তো! হনুমানের হঠাৎ এত খাতির?'

'খাতির হবে না! হনুমান যে একজন টিভি স্টার এখন। রামায়ন দেখ না!'

হনুমানের খাতির বেড়েছে। সেদিন বেপাড়ার এক মাস্তান এসে এপাড়ার সেরা মাস্তানের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাল ঠুকছে—'এ বালু সুগ্রীব তেরে যুধ্ কে লিয়ে লড়কাতা, এ বালে!' রামরাজত্ব সত্যই তাহলে এল। রামনাম সত্য হ্যায়। সরষের তেলে ক্যা হ্যায়।